কিশোর ভারতী
দ্বিতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা
কার্তিক ১৩৭৬ • নভেম্বর ১৯৬৯
সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

দেশ

দেশ পত্রিকা লিখেছেনঃ "কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির আয়ু মাত্র এক বৎসর, এরই মধ্যে শিশু সাহিত্যের আসরে সে প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। ......**বাংলার প্রায় শতাধিক সাহিত্যিকের সচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটি কিশোরদের পূজার দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে**।......"

যুগান্তর (*সাময়িকী*)

যুগান্তর (সাময়িকী) বলেনঃ "কিশোরদের মন আর চাহিদা মেটাবার মতো অথচ বর্তমান বিজ্ঞান,, শিল্প আর সাহিত্যের ক্রম-অনুযায়ী তাদের মানসিক পরি-পুষ্টির সহায়ক পত্র-পত্রিকার অভাব এদেশে খুবই। এরই মাঝে 'কিশোর ভারতী' বর্ষকালের মধ্যেই এদিক থেকে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি যে সফল করতে পেরেছেন আর তাদের উদ্যম যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান শারদীয়া কিশোর ভারতী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। **বাংলাদেশের প্রবীণ অনেক লেখকেরই লেখা এতে আছে। একথা বলা চলে যে, শুধু 'লেখার' জন্যই তাঁরা লেখেন নি, আমাদের কিশোরদের মনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা লিখেছেন**।. তার উপর সুন্দর কাগজে, চিত্তাকর্ষক ছবিতে সংখ্যা-খানি ভরপুর। যাঁদের ছবি আছে, তাঁরাও কুশলী ও কৃতী শিল্পী।......

দৈনিক বসুমতী

দৈনিক বসুমতী-র সুচিন্তিত অভিমতঃ ......ছোটদের উপযোগী যে কয়েক-খানি শারদসংকলন হাতে পেয়েছি তার মধ্যে **এই বৎসরের "শারদীয়া কিশোর ভারতী" অদ্বিতীয়। এই রকম একখানি শিশুমনোপযোগী সুন্দর শারদসংকলন যে কোন বাড়ীতে, লাইব্রেরীতে, স্কুলে রাখা প্রয়োজন। রুচিসম্পন্ন সম্পাদনা শিশুদের নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে**।..

কিশোর ভারতীর অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই

★

ডিএনবিএ ব্রাদার্স

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন : কলিকাতা ৯

বিদ্যোদয়ের বই

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি
সমরজিৎ কর

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত একটি দ্বীপের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে, 'স্কুইরেল' নামে একটি মালবাহী জাহাজের নাবিকরা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করার মতোই একদিন খোঁজ পেল ভয়ঙ্কর সেই মানুষটির, একমাত্র যার উদ্ভট মগজেই বুঝি জেড রশ্মি গজাতে পারে। ওকে অর্থাৎ পিয়ার্সনকে ধ্বংস করতে গিয়ে সকলের কি অবস্থা হয়েছিল বিজ্ঞানাশ্রয়ী ও অ্যাডভেঞ্চারধর্মী এই উপন্যাসটি তারই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী॥ [মূল্য ৩·২৫]

কঙ্কাবতী [২য় সংস্করণ]
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুর মধ্যে একটি অভিমত "মৃদু মৃদু ব্যঙ্গ শ্লেষ এবং তিরস্কারের সঙ্গে উদ্দাম উদ্ভট এবং উধাও করা কল্পনা আর প্রচুর পরিমাণে কৌতুকরস মিশিয়ে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যে বিরাট দান রেখে গেছেন কঙ্কাবতী তারই একটি অংশ।..." [যুগান্তর]

[মূল্য ৩·৫০]

অথ ভারত কথকতা [২য় সংস্করণ]
শ্রীকথকঠাকুর

বহুর মধ্যে দুটি অভিমত "গ্রন্থের লেখক ছদ্মনামে অবতীর্ণ হলেও তিনি পাকা লেখক। লেখক কথকতার সুরে গল্প-রস পরিবেশন করেছেন...যার আকর্ষণ বহু আবৃত্তিতেও ম্লান হয় না। বইখানি মুখ্যত ছোটদের জন্য, কিন্তু বড়রাও পড়ে খুশি হবেন।" **[আনন্দবাজার পত্রিকা]**

"(লেখক) মূল গল্পটিকে রাখিয়া তাহাতে নূতন 'রক্ত-মাংস ও মজ্জা' যোজনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই কাজ তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় সমাধা করিয়াছেন। দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করিতে হয় যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই বই পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবে।" [দেশ] [মূল্য ৩·০০]

সুশীল জানার

গল্পময় ভারত প্রথম খণ্ড   গল্পময় ভারত দ্বিতীয় খণ্ড

বহুর মধ্যে একটি অভিমত : "...ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে যে অতুলনীয় কাহিনীসম্পদ রহিয়াছে, বলিতে গেলে তাহাই মন্থন করিয়া শ্রীজানা এই গল্পগুলি সংকলন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য উপনিষদ, জাতক, ধম্মপদ, জৈনকথা, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, বাসবদত্তা, হর্ষচরিত, মালতীমাধব, মুদ্রারাক্ষস, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থ হইতে ২৮ টি গল্প তিনি চয়ন করিয়াছেন। এই অতুলনীয় গল্পসম্পদ যে ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার সহিত রূপকথা বলার ভঙ্গী মিশান থাকায় গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হইয়াছে।...গল্পগুলি দেশের ছেলেমেয়েদের প্রাচীন যুগের মানুষদের সত্য-প্রীতি, দেশাত্মবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক আচার-আচরণের সঙ্গে পরিচিত করিবে। 'গল্পময় ভারত'কে আমরা বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া অভিনন্দন করিতে পারি।" [যুগান্তর] [মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩·০০]

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন ৩৪-৩১৫৭

কিশোর ভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
কার্তিক ১৩৭৬/নভেম্বর ১৯৬৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা — ২৯৩

মামাবাবুর রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী : ধারাবাহিক উপন্যাস

পাহাড়ের নাম করালী—প্রেমেন্দ্র মিত্র — ৩২৭

জীবজগতের বিচিত্র কাহিনী

লোমে ঢাকা আজব মানুষ—বীরু চট্টোপাধ্যায় — ৩১৯

অতীতের পাতা থেকে

ইতিহাসের দিনলিপি—দীপালি হালদার — ৩৪২

হাসির গল্প

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে—শৈলেশ ভড় — ২৯৪
দুই সম্পাদক—টুটুল দাশগুপ্ত — ৩২২

মরু-গিরি-কান্তারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম : ধারাবাহিক উপন্যাস

দুরন্ত ঈগল—দীননাথ কাশ্যপ — ৩০৩

কবিতাগুচ্ছ

ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে—গোবিন্দপ্রসাদ বসু — ৩১৩
ঘুম ভাঙানো ভোর—বিভূতি ভট্টাচার্য — ৩১৩
উত্থান—প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত — ৩১৩
বিয়ের ভোজ—যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার — ৩১৪
বুদ্ধি-চুরি—কালিদাস ভট্টাচার্য — ৩১৪
বর্ণপরিচয়ের লেখককে!—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩১৪

দেশাত্মবোধক রোমাঞ্চকর কাহিনী

বোলতা সেনাপতি—মিহির সেন — ২৯৭

আজব গল্প

সিংখুড়োর শিক্ষা পরিকল্পনা—বিমল দত্ত — ৩৩১

মিষ্টি গল্প

খুনটুসি ঘেউঘেউয়ের গল্প—শিশির মজুমদার — ৩০০

দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর গল্প

লোভ—শ্রীধর সেনাপতি — ৩৩৫

সামাজিক গল্প

সদা সত্য কথা বলিবে!—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩১৫
গুপীদাদুর গল্প—সুতপা চক্রবর্তী — ৩২৪

কবিতা ও ছড়া

খোকনের জয়—রাম চট্টখুণ্ডী — ৩৩৩
লাক—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ৩৩৩

কাক-সংবাদ—শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা ৩৩৩
গুণ করে খাই—সৌরেন্দ্রমোহন বসু ৩৩৪
আটুল বাটুল—রবীন্দ্রনাথ রায় ৩৩৪
স্বপ্নের রাজ্যে—সঞ্জিতকুমার সাহা ... ৩৩৪
ঠাম্মা এসো, আমরা তোমায় গান শোনাই—সুশীল মণ্ডল ৩৩৪

গল্পের যাদুঘরে
বুমেরাং—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩০

গ্রাহক-গ্রাহিকার আসর
রীতিমতো নাটক! (গল্প)—অলোককুমার ধর ৩৪৫
তেষ্টা মেটাবার উপায় (কবিতা)—উত্তমকুমার বটব্যাল ৩৪৮
এখন আমি (কবিতা)—অশোক চক্রবর্তী ৩৪৮
আমার দেশের কিশোর (কবিতা)—সুরজিৎ সাঁতরা ৩৪৮

খোলামনের মেলাতে
সুজনবন্ধুর বৈঠক ৩৪৯

বিজ্ঞানীর দপ্তর
নিজে করো সূর্যঘড়ি—সমীরকুমার ঘোষ ৩৫১
বিজ্ঞানের টুকরো কথা—অণুবীক্ষণ সমাদ্দার ৩৫২
বিজ্ঞানের টুকরো কথা—অমল মজুমদার ৩৫২

ধাঁধা-হেঁয়ালি
শব্দ-হেঁয়ালি ৩৫৩
গত ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ৩৫৪

খেলাধুলো
ব্যাটিং শেখার গোড়ার কথা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৫
খেলার আসর—শ্রীসাংবাদিক ৩৫৭

সওয়াল-জবাব
প্রশ্নোত্তর-বিভাগ—বাণী মৌলিক ৩৫৮

ছবিতে আজব কাহিনী
পটলচাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান [৪ পৃঃ]—নারায়ণ দেবনাথ ৩৪৪

ছবিতে হাস্যকৌতুকের ধারাবাহিক গল্প
ডমরু-চরিত—শৈল চক্রবর্তী ৩১২

টুকরো হাসি
একটু হাসো!—রাম চট্টখণ্ডী ৩৪১

প্রচ্ছদ
পশ্চিম বাঙলার দক্ষিণে সুন্দরবন ও সমুদ্রের একটি দৃশ্য—**শিল্পী সূর্য রায়**

প্রাপ্তিস্থান

কিশোর ভারতী কার্যালয়॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
ডিএনবিএ ব্রাদার্স॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

মূল্য ঃ পঁচাত্তর পয়সা

শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত এবং
তৎকর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত

আমাদের কথা

স্নেহের বন্ধুগণ,—তোমরা সকলে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করো। কিশোর ভারতীর দূরের ও কাছের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুদেরও জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার।

পুজোর দীর্ঘ অবকাশ শেষ হতে চললো। ছুটি আশা করি তোমাদের ভালই কেটেছে।

কেমন লাগলো এবারের শারদীয়া কিশোর ভারতী? যেটুকু সংবাদ ইতিমধ্যে তোমাদের কাছ থেকে এসেছে, তাতেই কিছুটা আঁচ করতে পারছি তোমাদের বক্তব্য। সত্যি কথা বলতে কি, অতীতের পুনরাবৃত্তি করে আবার আমাদের বলতে হয়, এবারের শারদীয়া কিশোর ভারতীর এতখানি চাহিদা ও সমাদর আমাদেরও কল্পনার বাইরে ছিল। অবশ্য মাত্র এক বছর বয়স হলো কিশোর ভারতীর, তাতে কল্পনা করতে না পারাটা অস্বাভাবিক নয়। শুধু কি তোমাদেরই কাছ থেকে—বড়দের কাছ থেকেও এবার সে যে স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করেছে, তার পরিমাপ করার সাধ্য আমাদের নেই।

তোমরা যারা স্কুলে পড়ো, সামনেই তাদের পরীক্ষা। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এখন নতুন ক্লাশে ওঠার বা স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলেজে ঢোকার স্বপ্ন দেখছো। আর যারা কলেজে ঢুকেছ, তারাও চাইছ কলেজের আগামী পরীক্ষায় ভাল ফল করতে।

তোমাদের বন্ধু, সহযাত্রী ও মুখপত্র হিসাবে কিশোর ভারতীও তো তাই চায়। সে কি স্বপ্ন দেখে জান? দেশের আদর্শবান কৃতী সন্তান হিসাবে ভবিষ্যৎ জীবনযুদ্ধে তোমরা জয়ের গৌরব অর্জন করেছ,—এই স্বপ্নই দেখে সে। আর সেইজন্যেই তো দেশ-বিদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাস থেকে, যা কিছু সুন্দর ও তোমাদের আনন্দ দেবার মতো, তা-ই চয়ন করে তোমাদের কাছে পরিবেশন করতে তার চেষ্টা ও যত্নের শেষ নেই।

বর্তমান সংখ্যায় দেখবে, নতুন আর একটি বিভাগ খোলা হলো—ইতিহাসের দিনলিপি। ইতিহাসের পাতায় প্রতি মাসের এমন অনেক দিন চিহ্নিত হয়ে আছে, যা আমাদের কাছে স্মরণীয়। এইসব দিনে মনে রাখার মতো বহু ঘটনা ঘটেছে অতীত পৃথিবীর বুকে। সেই-সব ঘটনার কাহিনী সংক্ষেপে গল্পের মতো করে তোমাদের শোনান হবে ইতিহাসের দিনলিপিতে। কিন্তু এক মাসের সব ঘটনা একসংগে দেওয়া তো সম্ভব নয়। তাই, মনে করো, এই নভেম্বর মাসের বিভিন্ন দিনে যেসব স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে, তার একটা অংশ এবার তুলে ধরা হলো, আগামী বছরের নভেম্বর মাসে আবার তুলে ধরা হবে আরো কিছু ঘটনা। এমনি করে ইতি-হাসের দিনলিপি চলবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। বিভাগটি তোমাদের কেমন লাগলো এবং এসম্বন্ধে আর কোন পরামর্শ থাকলে, আমাদের জানাতে ভুলো না কিন্তু।

আবার তোমরা আমাদের প্রাণভরা স্নেহাশিস্ গ্রহণ করো। ইতি—

তোমাদেরই বন্ধু
সম্পাদক

শৈলেশ ভড়

হোস্টেলে থেকে স্কুলে পড়ে দিবাকর।

হোস্টেলের তিনতলায় থাকেন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট কেশববাবু। স্কুলে তিনি ইতিহাসও পড়ান। ভারী কড়া মেজাজের লোক। রাত্রি এগারোটার পর আলো জ্বালিয়ে পড়া মুখস্থ করা কিংবা জমিয়ে আড্ডা মারা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। তাই ছেলেরা এসব বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার থাকে।

আর না থেকেই বা উপায় কি?

রাত্রে মাঝে মাঝে খাওয়াদাওয়া সেরে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনের ছাতটায় এসে দাঁড়ান। এখান থেকে হোস্টেলের সব কয়টি ঘর পরিষ্কার দেখা যায়।

দরজা-জানলা বন্ধ করেও আলো জ্বালিয়ে রাখবার উপায় নেই। কারণ প্রত্যেকটি ঘরে একটি করে ভেন্টিলেটার আছে, সেখান দিয়ে ঘরের আলো দেখা যায়। তাই এগারোটা বাজবার ঘণ্টা পড়লেই ছেলেরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

পরীক্ষার সময় দিবাকর একদিন ধরা পড়ে গেল। অনেক রাত্রে আলো জ্বালিয়ে সে পড়া করছিল, এমন সময় বন্ধ দরজার ওপর কয়েকটা টোকা পড়লো।

দিবাকর দরজা খুলে দিয়ে দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং কেশববাবু। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল একধারে।

'আলো জেবলে কী করছিলে?'

'পড়ছি স্যার।' ঘাড় চুলকে দিবাকর বললে।

'রাত জাগলে শরীর খারাপ হয় তা জানো?'

দিবাকর চুপ করে রইল।

'যাও শুয়ে ঘুমোও গে। আর কখনও এমন কাজ করো না।' কেশববাবু ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

রাত জেগে লেখাপড়া করা তিনি পছন্দ করেন না। বলেন, 'সমস্ত নিয়মমত করা উচিত। শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকলে চলবে না। স্বাস্থ্যের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। মনের সঙ্গে শরীরের ভীষণ ভাব, একেবারে গলায়-গলায় বলতে পারো।'

যাই হোক্, সে-রাত্রের মত দিবাকরকে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে হলো। কিন্তু ঘুম এল না। মনে মনে সে মতলব আঁটতে লাগলো। এখন থেকে রাত জেগে না পড়লে পরীক্ষায় সে সুবিধা করতে পারবে না কিছুতেই। ভাবতে ভাবতে চমৎকার একটা ফন্দি এল মাথায়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা কার্ডবোর্ড কেটে ভেন্টিলেটারের ফাঁকটা সে বন্ধ করে দিলে। যাক্, বাঁচা গেল এবার। এখন সে একেবারে নিশ্চিন্ত। অনেক রাত অবধি পরীক্ষার পড়া সে পড়তে পারবে।

সেদিন অনেক রাত্রে, কত রাত ঠিক মনে নেই, ঘরের আলোটা টুপ্ করে নিবে গেল হঠাৎ।

এ কী হলো? কেশববাবু বোধহয় জানতে পেরেছেন কোনরকমে। ভয়ে সে কাঠ হয়ে ঘামতে লাগলো।

খস্ খস্ খস্ খস্। বাইরে বারান্দা দিয়ে এক-জোড়া পায়ের শব্দ যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। কেশববাবুর নয় তো? কে জানে। দিবাকর নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

খস্ খস্ খস্ খস্। শব্দটা ধীরে ধীরে তার ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল বারান্দার ও-প্রান্তে।

দিবাকর যেন একটা রহস্যের গন্ধ পেল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। না, কেউ কোথাও নেই।

গল্পে পড়া ঘুমন্ত একটা পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে হোস্টেলটাকে। আর কী ভীষণ অন্ধকার চারদিকে। নিজের হাতটাও ভালো করে দেখা যায় না।

ঘরের মধ্যে ফিরে এল দিবাকর।

খস্ খস্ খস্ খস্। বোঝা গেল শব্দটা উল্টো দিক থেকে আসছে এবার। দিবাকর নিঃশব্দে দরজা খুলে আবার বেরিয়ে এল। কালো একটা বিড়াল ছুটে পালিয়ে গেল তাকে দেখে। অন্ধকারে চোখটাই তার নজরে পড়ে। অনেক দূরে কোথায় একটা কুকুরের একঘেয়ে কান্না শোনা যাচ্ছে। এ ধারে সতের নম্বর ঘরের সামনে কি একটা যেন দুলছে। বেড়ালটা সেখানে এসে একবার পিছন ফিরে তাকালো। তারপর মিহিসুরে একটা ভেংচি কেটে দে ছুট্।

না, কেউ কোথাও নেই। আর কী আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে দিবাকরের ঘরের আলোটা আবার জ্বলে উঠলো নিঃশব্দ অট্টহাসির মত!

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে দিবাকর দরজার আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো। ভয় সে পেয়েছে ঠিকই, তাই বলে সাহসটা একেবারে হারায় নি। ঘটনার মধ্যে কোথায় যেন একটু রোমাঞ্চ আছে।

খস্ খস্ খস্ খস্। চলার শব্দটা আবার এগিয়ে আসছে এদিকে। দিবাকর এবার স্পষ্ট দেখতে পেল, কালো কাপড়ে ঢাকা একটা ছায়ামূর্তি চুপিসাড়ে চলে যাচ্ছে তার দরজার সামনে দিয়ে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো সে। তারপর পিছন থেকে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই চলমান ছায়ামূর্তিটার ওপর। তারপর যুযুৎসু'র একটা প্যাঁচ খেয়ে নিজেই ছিট্‌কে পড়লো দূরে। দেয়ালে মাথা লেগে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলো, সে তার নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে আর দরজাটা খোলা—হাহা করছে। তবে কি গতরাত্রে সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল? কিন্তু মাথার পিছনে হাত দিতেই সে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। জায়গাটা এখনো ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

দিন পেরিয়ে আবার রাত এল। সে-রাত আরো গভীর হলো। দিবাকর তার ঘরের খোলা জানলাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। আকাশে জোনাকির মত তারা জ্বলছে অসংখ্য। চাঁদ ওঠে নি আজ। অমাবস্যা বোধ-হয়। রাস্তার পাশে অশ্বত্থ গাছটার পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে। সাপের মত পিচ্ছিল ঘুমন্ত পথ। পাশের

...ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই চলমান ছায়ামূর্তিটার ওপর।

বাড়ির একটা ছেলে পড়ে দিবাকরের সঙ্গে। তার ঘরে আলো জ্বলছে আর তার খানিকটা আভা এসে পড়েছে রাস্তার ওপর।

হোস্টেলের দরজাটা আব্ছা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সামনের ছোট একটা উঠোনের পরেই কাঠের একটা দরজা। তার পাশে খাটিয়ায় শুয়ে থাকে দরোয়ান সিন্ধি টেনে।

ঢং। কোথায় কোন্ ঘড়িতে সশব্দে একটা বাজলো। আর সেই সঙ্গে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি হোস্টেলের দরজা টপ্‌কে লাফিয়ে পড়লো উঠোনে।

সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এল নীচে। নিস্তব্ধতায় চারদিক থম্‌থম্ করছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ দিকে স্নানের ঘর। দিবাকর নিঃশব্দে ঢুকে পড়লো সেই ঘরের মধ্যে। ছায়ামূর্তিটা দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, জমাট একটি চলন্ত অন্ধকার। স্নানের ঘরের মধ্যে থেকে দিবাকর সমস্ত দেখতে পাচ্ছে। ভয়ে তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে যেন। এমন সময় কোথা থেকে একটা উইচিংড়ে উড়ে এসে বসলো তার নাকের ডগায়। আর একটু হলে সে হেঁচে ফেলছিল আর কি।

সিঁড়ির পাশের দেয়ালে আলোর মেন সুইচ। ছায়া-মূর্তি সেখানে এসে এক মুহূর্তের জন্যে থামলো। খুট্ করে একটা শব্দ হলো অন্ধকারে। তারপর মূর্তিটা ঘুরে আবার উঠতে লাগলো দোতলায়।

আলো নিভে যাওয়ার রহস্যটা দিবাকরের কাছে

বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল এতক্ষণে। সিঁড়ির মুখে ছায়া-মূর্তিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে দিবাকর ওপরে উঠে এল।

খানিকটা আসতেই আবার দেখা গেল মূর্তিটাকে। চলার গতিতে তার যেমন দ্রুততা তেমনি সাবধানতা।

একটা দূরত্ব রেখে দিবাকর ওকে অনুসরণ করতে লাগলো। দোতলায় উঠে মূর্তিটা থেমে গেল একবার। চারদিকটা দেখে নিল, তারপর বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে চললো। একটু পরে আর তাকে দেখা গেল না।

দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ন করে দিবাকর তাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথাই। গেল কোথায় সে? বারান্দার মধ্যে কোনো গুপ্ত দরজা আছে না কি? কিংবা এর সবটাই ভৌতিক!

কথাটা মনে হতেই দিবাকর হাসলো। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগে 'ভূত' মানতে সে রাজী নয়।

একটা অন্ধকার কোণ বেছে নিয়ে দিবাকর তার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে। যে মেন সুইচটা সে এইমাত্র নিবিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা জ্বালতেও আবার তাকে ফিরে আসতে হবে।

একটু পরে কোথায় একটা দরজার খিল খোলার শব্দ পাওয়া গেল। কেউ উঠলো বোধহয়। অন্ধকারের আবছা আলোতে ভেসে উঠলো যে ছেলেটির মুখ, তার নাম গণেশ চাকলাদার। স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র সে। আজ চার বছর ধরে সে একই ক্লাসে পড়ে আছে। ছেলেদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, ধৈর্য পরীক্ষায় সে রবার্ট ব্রুশকেও হার মানাবে।

দিবাকর আর অপেক্ষা করলো না। গণেশের পাশ কাটিয়ে ছায়ামূর্তিটা যে পথে মিলিয়ে গেছে, সেই পথে চলতে শুরু করলো। তারপর অন্ধকারে আর দেখা গেল না দিবাকরকে।

একটু পরে গণেশ ফিরে এল তার ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন কথা বলে উঠলো, 'চিনতে পারো আমাকে?'

'কে?' ভয়ে গণেশের গলার স্বর যেন বুজে এসেছে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো কোনরকমে।

'আলোটা নিবিয়ে দাও গণেশদা। কেশববাবু জানতে পারলে তোমায় আর আস্ত রাখবেন না।'

'ওরে হতভাগা, তুই এসে ঢুকেছিস্ এখানে?' ধড়ে যেন প্রাণ আসে গণেশের, 'তাই তো বলি—'

'তার আগে আলোটা নিবিয়ে দাও গণেশদা।' দিবাকরের গলায় অনুরোধের সুর।

আলো নিবে গেল। আর সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গণেশ যেন নিজেই নিজেকে ভেংচি কাটলো, 'আমার আবার ভয় কি? আলো জ্বেলে পড়ছি না তো'।

'তার চেয়ে আরো সাংঘাতিক কাজ করেছ।'

'কি করেছি?' গণেশ এগিয়ে আসে।

দিবাকর বলতে লাগলো, 'রাত একটার সময় হোস্টেলের দরজা টপকানো, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মেন সুইচ বন্ধ করে দেওয়া, ইত্যাদি আরো কত কি?'

'সত্যি তোর বুদ্ধি আছে দিবাকর।' গণেশ এবার হার মানলো, 'দেখতে ক্যাবলা হলে কী হবে। হ্যাঁ, তোর সাহস আছে বটে। আচ্ছা, আমাকে তুই চিনলি কি করে? গোয়েন্দাগিরি করছিলি নাকি?'

'তার আগে বলো, এই রাতে বাইরে তুমি কী করো?'

'থিয়েটারের 'রিহার্সাল দিচ্ছি রে পাগ্‌লা! ক্লাবে সিরাজদ্দৌলা নাটক হবে। যাবি নাকি দেখতে?'

'ও!' দিবাকরের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না।

এতবড় একটা কৃতিত্বে এমন উপেক্ষার ভাব ভালো লাগলো না গণেশের। ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'তোরা এসবের কী বুঝবি? থিয়েটার যে কত বড় একটা আর্ট, তার বুঝবি কি? লেখাপড়াই শিখবি কেবল। মানুষ হবি না। পড়েছিস্ নাটকখানা?'

'না। স্কুলের বই পড়েই সময় পাই নে।'

'ঐ স্কুলের বইয়ের পোকা হয়েই থাক্। কিস্সু হবে না তোদের।' গণেশ রীতিমত বিরক্ত।

'একটা কথা বলবো গণেশদা?'

'কি?' গলার স্বরটা একটু যেন নরম ঠেকলো।

'কালরাত্রে যুযুৎসুর যে প্যাঁচটা কসিয়েছ আমার ওপর, সেটা শিখিয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

'কেন. চোরের ওপর বাটপাড়ি করবি নাকি? আচ্ছা, কাল তোর খুব লেগেছিল, না রে?'

'লেগেছিল বৈ কি।' দিবাকর আহত জায়গাটায় একবার হাত বোলালো, 'এখনো মাথাটা ফুলে আছে।'

'দুঃখ করিস্ নে।' গণেশ অন্ধকারে ওর পিঠে চাপড়ে দিলে, 'পেটভরে একদিন খাইয়ে দেবো।'

'ঠিক বলছো?'

'হ্যাঁ রে পাগল, ঠিক বলছি। কিন্তু মনে রাখিস, এসব কথা কেউ যেন না জানতে পারে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তোমারও মনে থাকবে তো?'

'থাকবে থাকবে।' অন্ধকারেও গণেশের সাদা দাঁত-গুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো, 'এখন শুতে যা, অনেক রাত হয়ে গেল।'

বোলতা সেনাপতি

মিহির সেন

না, বোলতাদের বোলতা-সেনাপতি নয়, বোলতাদের এক মানুষ সেনাপতির গল্প এটি, যার নির্দেশে বোলতা-সেনাবাহিনী শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারপর কাজ সেরে আবার ক্লান্ত সৈনিকের মতই নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসত। এই সেনাপতি মানুষটি থাকত চোখের আড়ালে, কিন্তু তার বোলতা সেনাদের দৌরাত্ম্যে শত্রু সেনাবাহিনী নাজেহাল হয়ে উঠত। মানুষ হলে, সে সৈন্যই হোক, বা গেরিলা বাহিনীর লোকই হোক, তার সঙ্গে লড়া যায়। কিন্তু এই আজব বোলতাবাহিনীর সঙ্গে কি করে যুঝবে, ভেবে উঠতে পারে না বাঘা বাঘা মার্কিন সৈন্যরাও।

বোলতাদের এই সেনাপতি লোকটির নাম ছিল নগুয়েন ভ্যান তু। গ্রামের লোকের কাছে তু নামেই পরিচিত। এমনি দেখতে সাদাসিধে ভাল মানুষ, কিন্তু ওর মত দুর্জয় সাহসী আর চতুর গেরিলা যোদ্ধা সারা অঞ্চলে খুব কমই ছিল।

আর অদ্ভুত অদ্ভুত সব বুদ্ধিও খেলত তুর মাথায়! এমনিতেই অবশ্য গেরিলাদের একটা বড় অস্ত্রই হল বুদ্ধি আর কৌশল। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিরাট সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক সময়ই তাদের লড়তে হয় প্রায় খালি হাতে, সামান্য কজন গেরিলা যোদ্ধা নিয়ে। তাই মাথা খাটিয়ে তাদের নানা রকম কৌশল বের করতে হয় পরিস্থিতি বুঝে।

এ দিক দিয়ে তু ছিল এ ব্যাপারে এ অঞ্চলের সবার সেরা। একটা ঘটনা বলি। একদিন দেখা গেল, তু মাঠের কাজে না গিয়ে একটা খালি পেট্রলের টিন নিয়ে কি যেন করছে। নিজের মনে বসে বসে টিনটা কেটে-কুটে কি যেন বানাচ্ছে। ওর চার পাশে কৌতূহলী বাচ্চাদের ভীড়। তু খুড়ো কি খেলনা করছে রে বাবা!

একদিক দিয়ে কথাটা অবশ্য সত্যি। তু একটা খেলনাই বানাচ্ছে—একটা খেলনা মাইন। টিনটা কেটেকুটে জিনিসটা তৈরি করে তার ওপর তু যখন এক পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে দিল, তখন দেখে কে বলবে না যে, ওটা একটা সত্যি মাইন!

জিনিসটা তৈরি করে তু বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ব্যস্, খেল খতম! এবার সবাই কেটে পড়।

তখনকার মত খেল খতম হলেও এটা নিয়ে তুর আসল খেল শুরু হল রাত নিশুত হলে। খেলনাটা নিয়ে তু সন্তর্পণে বড় রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল—দিনের বেলা যে রাস্তার ওপর দিয়ে ভাড়াটে আমেরিকান আর সায়গনের পুতুল-সৈন্যরা যাতায়াত করে ও গ্রামে এসে উপদ্রব করে।

চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে রাস্তার ওপর খেলনাটা পুঁতে রাখল তু। তারপর একটা গোপন ফিউজ-তার রাস্তার ওপর পেতে রেখে কেটে পড়ল সেখান থেকে।

ভোর হতেই দুটো শত্রু-সৈন্য টহল দিতে দিতে জায়গাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ওদের অভ্যস্ত চোখে গোপন ফিউজ-তারটা ধরা পড়ে যায়। একজন এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে তারটা কেটে দিল। ব্যস্, আর ভয় নেই। গেরিলা শয়তানগুলোর পরি-কল্পনাটাকে এ ক্ষেত্রে অন্তত বানচাল করে দেওয়া গেল।

বেশ কিছুটা আত্মতৃপ্তি বোধ করে সৈন্য দুটি। তারপর মাইনটা খুঁড়ে তুলবার জন্য দুজন আমেরিকান সৈন্যকে ডেকে আনে সেখানে।

তারটা কাটা হয়ে গেছে, সুতরাং আশু বিপদের আর ভয় নেই। আমেরিকানদের একজন তাই কিছুটা তাচ্ছিল্যভরে মাটি খুঁড়ে মাইনটা থাবা দিয়ে ধরে টেনে বের করার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ—বুম্-ম্-ম্! তিন জনের নিষ্প্রাণ দেহ হাত-পা ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তার ওপর।

জীবিত সৈনিকটি তো বিস্ময়ে হতবাক। তারটা কেটে দেবার পরও মাইনটা ফাটল কি করে!

আসলে তো আর মাইনটা ফাটেনি। তা ছাড়া, ওটা তো মাইনই নয়, তুর তৈরী নকল খেলনা মাইন। ওটা পেতেছিল সে ওদের ধোঁকা দেবার জন্য। নকল মাইকের তারটাও সে এমনভাবে রেখেছিল, যাতে সহজেই তা শত্রু সৈন্যের চোখে পড়ে। আসলে যেটা ফেটেছে সেটা মাইন নয়, ঐ খেলনা মাইনের তলে লুকিয়ে রাখা একটা তাজা হাতবোমা। মাইনের অভিনয়টুকু ছিল আসল বোমার ব্যাপারে শত্রুদের অন্যমনস্ক ও অসাবধান করে দেওয়া।

ঘটনার বিবরণ গ্রামে পেঁাছলে সবাই হেসে বলল, এ নিশ্চয়ই আমাদের সেই বোলতা-সেনাপতির কাজ। ও না হলে আর এমন কূটবুদ্ধি মাথায় খেলবে কার?

গেরিলাদের যে কোন কূটবুদ্ধি বা নতুন কলা-কৌশলের সঙ্গে এমনিভাবেই তুর নামটা জড়িয়ে গিয়েছিল ও অঞ্চলে। অবশ্য এই কূটবুদ্ধির সুনামটা ও প্রথম অর্জন করেছিল এ ঘটনার অনেক আগে—ওর বোলতা সেনাবাহিনীর দৌলতে, যে জন্য আজও গ্রামের সবার কাছে তুর আসল পরিচয় বোলতা-সেনাপতি। সেই কথাই এবার বলব।

এ অঞ্চলের গেরিলাবাহিনীর হাতে তখন পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র কিছুই এসে পেঁাছায়নি। প্রায় খালি হাতেই প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হচ্ছে।

দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের মুক্তি-ফ্রন্ট থেকে তুর ওপর নির্দেশ এল সড়ক-বাহিনীতে কাজ করার। শত্রুসৈন্যের যাতায়াতের পথে ফাঁদ পেতে রাখা বা অবরোধ সৃষ্টি করাই সড়ক-বাহিনীর প্রধান কাজ।

এই নতুন কাজের ভার পেয়ে তু দারুণ গর্বিত ও উল্লসিত। কিন্তু সেই সঙ্গে গভীরভাবে চিন্তিতও। এমনি খালি হাতে কি ভাবে আর কত দিন লড়বে ওরা অমন শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে? আগ্নেয়াস্ত্র বলতে কিছু নেই। শত্রুসৈন্য তার পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছে—যখন তখন গ্রামের ওপর চড়াও হয়ে লুটপাট, গ্রেপ্তার ও খুনজখম করছে।

চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না তুর। সারা রাত জেগে কাটায়। সেদিন রাত্রে, বৌ আর ওদের নতুন বাচ্চাটা দোলনা-বিছানায় তখন গভীর ঘুমে মগ্ন, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তুর কেন যেন বাড়ীর সামনের বোলতার চাকটার কথা মনে পড়ল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়বার সময় নাকি কোন কোন জায়গায় বোলতাদেরও কাজে লাগান হয়েছিল। কিন্তু সে সবই তুর শোনা কথা। কি ভাবে কাজে লাগান হয়েছিল কে জানে? শত্রু-সৈন্যর চলার পথে চাকটা পেতে রেখে? কিন্তু চাকটা অতদূর নিয়ে যাওয়া যায় কি করে?

তবু চিন্তাটা যখন মাথায় এসেছে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? পরদিনই একবার চেষ্টা করল তু চাকটাকে জায়গা থেকে সরিয়ে নেবার। কিন্তু বোলতারাই বা অত সহজে ছাড়বে কেন? ওরাও বাধা দিল তুকে। ফলে বেচারার ফুলে-ঢোল-হওয়া চোখমুখ নিয়ে বেশ কিছুদিন বিছানায় ছটফট করতে হল।

কিন্তু এতেই হাল ছাড়ার পাত্র নয় তু। একটু ভাল হয়ে উঠেই তু বেরিয়ে পড়ল বোলতাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে। দিনের পর দিন নিঃশব্দে বসে লক্ষ্য করতে লাগল বোলতাদের প্রতি মুহূর্তের আচার আচরণ অভ্যাস। এবং শেষ পর্যন্ত ওদের আক্রমণের হাত এড়িয়ে গোটা চাকটা সরিয়ে নেবার কৌশলও বের করে ফেলল সে। তারপর বন্ধুদের গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলল।

গেরিলা সেনারা তখন মাঝে মাঝেই শত্রুসৈন্যর যাতা-য়াতের পথে গর্ত খুঁড়ে তার ওপর লতাপাতা গাছের ডাল বিছিয়ে ফাঁদ তৈরি করে রাখত। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই শত্রুসৈন্যরা এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠল। সন্দেহ হলেই ওরা নেমে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে দেখত, ওটা ফাঁদ কিনা।

নিজেদের ভেতর আলোচনা করে বন্ধুরা ঠিক করল, একদিন ফাঁদের ভেতর একটা চাক রেখে দিয়ে দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়!

যেই ভাবা, সেই কাজ। পরদিন রাত্রেই ফাঁদের ভেতর বোলতার চাকটা লুকিয়ে রেখে তু নিঃশব্দে বসে রইল রাস্তার পাশে গোপন আশ্রয়ে।

ভোরে শত্রুসৈন্যরা যথারীতি টহল দিতে এসে ফাঁদটা দেখে ওটা সরাতে গেল। কিন্তু ফাঁদে হাত দিয়েই লাফিয়ে সরে এল তারা। তারপর পালাল চিৎকার

করতে করতে। খোঁচা খাওয়া বোলতাগুলো বহু দূর পর্যন্ত ওদের তাড়া করে নিয়ে গেল।

তু আর তার সঙ্গীরা তো আনন্দে আত্মহারা। ক্ষুদে বোলতাগুলো তো ট্রেনিং পেলে দারুণ ভাল সৈন্য হতে পারে!

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেল তু। রাত-দিন বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। কদিন পর বিরাট একটা চাক সংগ্রহ করে আনল বন থেকে। কিন্তু এবার সেটা ফাঁদে লুকিয়ে রাখার সময় বাড়তি আর একটা কৌশল অবলম্বন করল সে। চাকটার সঙ্গে একটা শক্ত সুতো বেঁধে সুতোর অন্য মাথাটা ধরে অনেকটা দূরে একটা গোপন জায়গায় বসে থাকল নিজে।

পরদিন ভোরে তিন লরি ভর্তি মার্কিন সৈন্য এসে হাজির ফাঁদটার সামনে। জায়গাটা পরীক্ষা করার জন্য দু জন সৈন্য দুটো হাত বোমা নিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচে। ওরা ফাঁদটার কাছে আসা মাত্র তু জোরে টান মারল সুতোটায়। গোটা চাকটা তাতে প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠল। রাগে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে এল বোলতার দঙ্গল। ছেঁকে ধরল লোক দুটোকে। হতচকিত সৈন্য দুটো বোলতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য হাত বোমা দুটো ব্যবহারের চেষ্টা করল। কিন্তু সে দুটো ফেটে গিয়ে নিজেরাই মারা পড়ল। দারুণ আক্রোশে বোলতাগুলো তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ট্রাক তিনটের ওপর। এই আচমকা আক্রমণে সৈন্যদের ভেতর চিৎকার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মুহূর্তের ভেতর ট্রাক তিনটে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই দিল চোঁচা ছুট। আর বোলতার হাত থেকে বাঁচার জন্য চলে এলোপাতাড়ি গুলি। সে কী দৃশ্য! গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আনন্দে নাচতে শুরু করে তু।

কিন্তু নিছক এতেই খুশী থাকে না তু। এবার বোলতা নিয়ে আরো গভীর গবেষণায় সে মেতে উঠল। কীটপতঙ্গের ওপর বইপত্তর যোগাড় করে পড়তে শুরু করল। এবং কিছুদিনের ভেতরই রীতিমত বোলতা-বিশারদ হয়ে উঠল।

এর পর শুরু হল তার বোলতাদের ট্রেনিং দেওয়া। এবং কিছু দিনের মধ্যেই বোলতাগুলোকে এমন শিক্ষিত করে তুলল যে, তুর ইশারা পেলেই ওরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত শত্রুর ওপর। আবার লড়াই শেষে শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মত ফিরে আসত নিজেদের আস্তানায়।

এর পর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তু বোলতাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি, দৈহিক পুষ্টি এবং ইন্‌জেক-শান দিয়ে ওদের ভেতর আরো বেশী তেজ ও প্রতি-হিংসা বাড়ানর পদ্ধতিও আবিষ্কার করে ফেলল। বোলতাগুলোকে যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল আর শত্রুকে মাইলের পর মাইল তাড়া করে নিয়ে যাবার পদ্ধতিও নিখুঁতভাবে শিখিয়ে দিল। এবং শেষ পর্যন্ত রীতিমত এক শিক্ষিত বোলতাবাহিনীই তৈরি করে ফেলল তু।

আর আশ্চর্য, বোলতা সেনারা শেষ পর্যন্ত শত্রু-মিত্রের প্রভেদ পর্যন্ত বুঝতে শিখে গেল। কারা যে শত্রুসৈন্য আর কারা গেরিলা যোদ্ধা, তা ওরা বেশ বুঝতে পারত। শুধু তাই নয়, কিছুদিন পর দেখা গেল, কারো ইশারা বা নির্দেশ ছাড়াই ওরা নিজেদের দায়িত্বে শত্রুসৈন্য দেখলেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

ফাঁদ আর এই বোলতাবাহিনীর সাহায্যে কিছু-দিনের ভেতরই তু তাদের গ্রামটিকে শত্রুসৈন্যের কাছে রীতিমত এক মরণ-ফাঁদ করে তুলল। বোলতাবাহিনীর কথায় শত্রুসৈন্যরা আতঙ্কে শিউরে উঠত।

আতঙ্কিত হবেই বা না কেন? একমাত্র ১৯৬৪ সালেই তু তার বোলতাবাহিনী নিয়ে ত্রিশটির বেশী লড়াই লড়েছে শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে। এবং পঞ্চাশজন সৈন্যকে খতম করে দিয়েছে তার বোলতা সেনারা।

গ্রামবাসীরা তাই ভালবেসে তুর নাম দিয়েছে—বোলতা-সেনাপতি।

আর শুধু সেই গ্রামেই নয়, সারা দক্ষিণ ভিয়েত-নামেই আজ এই বোলতা-সেনাপতির নাম লোকের মুখে মুখে। ছোটদের ও কিশোরদের কাছে এ এক মজার গল্প! দুঃসাহসিক লড়াইয়ের সত্য গল্প।

এমনি করেই স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াই করে চলেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ তাদের মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে। তারা লড়ছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সুবিশাল মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, যারা তাদের দেশ দখল করে রেখেছে আর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে দিনের পর দিন। মার্কিনীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে দেশের পুতুল-সরকার, সায়গন যাদের রাজধানী। জনসাধারণের এবং তাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে অস্ত্রশস্ত্র কম থাকলেও, যা আছে তার তুলনা নেই। সে হল তাদের অসাধারণ দেশপ্রেম, দুর্জয় সাহস আর অশেষ বুদ্ধি-চাতুর্য। তারই দাপটে অত্যাচারী মার্কিনবাহিনী আজ পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

ভিয়েতকঙ গেরিলা যোদ্ধাদের
একটি সত্য ঘটনামূলক কাহিনী।

খুনটুসি ঘেউঘেউয়ের গল্প

শিশির মজুমদার

খুনটুসি আর ঘেউ ঘেউ। একটি বিড়াল, একটি কুকুর। বেশ মিলে মিশে থাকে, আবার ঝগড়া-ঝাঁটিও করে। ঝগড়ার মূলে খুনটুসি। ঘেউ ঘেউ শান্ত শিষ্ট নিরীহ গো-বেচারা। ভর দুপুরে মিলুদের ফেলে দেওয়া চাট্টি ভাত আর মাছের শক্ত কাঁটা চিবিয়ে গাছের ছায়ায় টান টান হয়ে হয়তো একটু চোখ বুঁজেছে। ঠিক তক্ষুণি খুনটুসি পা টিপে টিপে এসে ওর লেজটা নিয়ে খেলতে শুরু করে। ঘেউ ঘেউ চোখ বুঁজেই খানিকক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু খুনটুসি নাছোড়বান্দা, ওকে না রাগিয়ে ছাড়বে না। আর রেগেও যায় ঘেউ ঘেউ। হঠাৎ ও লাফিয়ে উঠে গ্যাঁক করে কামড়ে দিতে যায়। আর খুনটুসি তখন তড়াক করে দূরে সরে গিয়ে লেজ ফুলিয়ে গোঁফ পাকিয়ে গর্জে ওঠে। খুনটুসির কাণ্ড দেখে ঘেউ ঘেউ একটু মুচকি হেসে লেজ গুটিয়ে শুয়ে পড়ে।

খুনটুসি কিন্তু খানিকক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে তার লেজ আর গোঁফ নরম হয়, গলা দিয়ে ডাক বেরোয় আদুরে আদুরে। সেই ডাকে ঘেউ ঘেউ চোখ মেলে চায়। জিভ বার করে একবার ঠোঁট চেটে নেয়। খুনটুসি তখন আবার ডাকে 'মেউ'। ঘেউ ঘেউ চোখ মেলে লেজ নাড়তে থাকে, ভাবখানা যেন—আয় না বোন, আয় না!

খুনটুসি খুশীখুশী হয়ে ঘেউ ঘেউর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ওর পেটে মাথা রেখে টুপ্ করে শুয়ে পড়ে। ঘেউ ঘেউ দু' একবার ওর গা চেটে দেয়, তারপর চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবার কখনো কখনো ওদের মজার খেলা দেখা যায়। হয়তো সে রাতে জোছ্না উঠেছে। ভুরভুর করে বাতাস দিচ্ছে। মিলুদের বাড়ির সামনের রাস্তাটায় জনমনিষ্যি নেই। সবার খাওয়া-দাওয়া সারা। খুনটুসি ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে বসে ডাকে, মেউ।

ঘেউ ঘেউ বাড়ির ভেতর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ডাকে, ঘেউ ঘেউ। খুনটুসি তখন লাফিয়ে উঠে একটা চোঁচা দৌড় লাগায়। ঘেউ ঘেউ ওর পেছু পেছু ছোটে। খুনটুসি দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ একটু ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর বোকা ঘেউ ঘেউটা টাল সামলাতে না পেরে হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়ে সামনে। খুনটুসি তখন লেজ গুটিয়ে বসে বসে তাই দেখে ডেকে ওঠে, মেউ মেউ। অর্থাৎ কেমন মজা, কেমন মজা। ওই ডাক না শুনে, ঘেউ ঘেউ ছুটে গিয়ে ওকে তাড়া করে। খুনটুসি লেজ তুলে পালায়।

এই ভাবে চলে ওদের মজার খেলা।

দেখতে দেখতে দু'তিন বছর কেটে গেছে ওদের এ বাড়িতে। ঘেউ ঘেউ এসেছিল রাস্তা থেকে আর খুনটুসি এসেছিল এক ঝড়ের রাতে তার মার সঙ্গে। তখন কতটুকুনি ছিল ওরা। মিলুর বড়ো আদরের ছিল এই দুটি। মিলুই ওদের এই নাম রেখেছে।

খুনটুসির নামটা খুনসুটি স্বভাবের জন্য। মিলু শুয়ে থাকলে, কিংবা খেতে বসলে খুনসুটি পাকানো ওর স্বভাব। খেতে বসলে ও হাত আঁচড়ে দেবে, গা চাটবে। মিলু ওর কান আচ্ছা করে মলে দিলে গুটি-সুটি মেরে ওর কোলে উঠে শুয়ে পড়বে।

ঘেউ ঘেউ ছোটটি থেকেই সরু গলায় চেঁচাত। তাইতে মিলু ওকে ডাকত ঘেউ ঘেউ। কিন্তু এই দু'তিন বছরে ওর স্বভাবটাও যেমন পালটেছে, চেহারাটাও তেমনি পালটেছে। এখন ঘেউ ঘেউ দুপুরের গরমে

জিভ বার করে হাঁ করে শুয়ে থাকে। আগে উঠোনে কাক পাখি বসলে ছুটে তাড়া করে যেত। কিন্তু ইদানীং সে ওসব ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপও করে না। বরং রাত দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অকারণেই কুৎসিত গলায় চেঁচায়। যদি গাছের পাতা খসে পড়ে কিংবা বেপাড়ার কোন কুকুরের ডাক শোনা যায়, তাহলে ও ভীষণ ভাবে খেঁকিয়ে ওঠে যা মিলুদের সকলেরই বিরক্তির ব্যাপার। মিলুর বাবা তো এখন এই কুকুরটা দেখলে তেড়ে মারতে যান। মিলুরও দু'চোখের বিষ।

খুনটুসিও আগের মতো নেই। পর পর দু'বছর দুটো বাচ্চা দিয়ে ওর স্বভাবটা হয়েছে হ্যাংলা। কোথাও কিছু আঢাকা পড়ে থাকলে মুখ দেওয়াটা ওর কাজ। আর দুধ বা মাছ ঢাকা থাকলেও উল্টে ফেলে খেতে কোন কসুর নেই। মিলুও আর খুনটুসিকে আগের মতো আমল দেয় না। সে এখন তার স্কুল, বই আর বন্ধু-দের নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এ বাড়ির সকলের বিরক্তি খুনটুসি আর ঘেউ ঘেউ বুঝতে পারছে। মিলুর ভালবাসা যে ওদের ওপর আর নেই, সেটাই ওদের বুকে গিয়ে সবচেয়ে বেশী লাগে।

একদিন খুনটুসি ঘেউ ঘেউকে বললে, চল দাদা, আর এ বাড়ি নয়।

ঘেউ ঘেউ খুনটুসির কথায় চমকে উঠল, তবে কোথায়! এ বাড়ি ছেড়ে গেলে আকালের বাজারে কে খেতে দেবে?

খুনটুসি বললে, তা হোক। খেতে না পাই, না পাব। তবু এ ভাবে লাঠি-ঝাঁটা খেয়ে সকলের চক্ষু-শূল হয়ে আর থাকতে চাই না।

ঘেউ ঘেউ মুখ গোমড়া করে ভাবে। খুনটুসিও তার পাশে বসে অধৈর্যে লেজ নাড়াতে থাকে।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে ঘেউ ঘেউ মুখ খোলে, বলে, তা যাবি কোথায়? একটা যাওয়ার জায়গা তো ঠিক করতে হবে? নাকি রাস্তার কুকুর-বেড়াল হয়ে থাকব?

খুনটুসি গোঁফ নাচাতে নাচাতে বলে, আমি তেমনি বোকা নাকি? ওসব কথা তোমায় ভাবতে হবে না। লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে চল তো!

পর দিন ওরা ভোর-ভোর থাকতে থাকতে মিলুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। সে বাড়ির পরে এক বিরাট মাঠ। মাঠ পেরোতে পেরোতে ওদের সন্ধ্যে হয়। মাঠের পরে বন। বনে ঢুকতে ঢুকতে রাত হয়। সারাদিন খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, তাই বনের মধ্যে ওদের পা আর চলে না। ঘেউ ঘেউয়ের জিভ বেরিয়ে পড়ে, খুনটুসির লেজ এলিয়ে পড়ে।

ঘেউ ঘেউ খুনটুসিকে বলে, এ কী করলি বোন! বেশ তো ছিলাম ওখানে—না হয় লাঠি-ঝাঁটা খেতাম, তবু তো দু'বেলা দুটি খাবার পেতাম।

খুনটুসি ওকে এক মুখঝামটা দেয়—কথার ছিরি দেখ না! তোমাদের কুকুর জাতের মতো বোকা পৃথিবীতে আর দুটি নেই। বেহায়াপনা আর কাকে বলে? লাঠি-ঝাঁটা খেয়েও দুটি খাবার খেতে চাও! ছিঃ ছিঃ, তোমার কি একটুকু পুরুষত্ব নেই!

খুনটুসির ধাতানি খেয়ে ঘেউ ঘেউয়ের জিভটা আরো বেরিয়ে আসে, ঘাড়টা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

রাত বেড়ে চলে, নিঝ্‌ঝুম রাত। আর বন ঘন হয়ে ওঠে, থমথমে বন। এতটুকু আকাশ দেখা যায় না কোথাও। ঝিকমিক জোনাকি ওড়ে মুঠো মুঠো—আশেপাশে সর্বত্র।

খুনটুসি মনে মনে ভাবে, এ বনে তো মাসী ছাড়া তার আর তেমন কেউ নেই। এ রাতে মাসীর দেখা পাব তো?

খুনটুসির হঠাৎ একবাটি দুধ খেতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে, আহা, মিলুর বাটির দুধটা বড়ো মিঠে ছিল। ঘন হয়ে সর জমে থাকত। কিন্তু মাসীর বাড়ি কি আর সেই দুধ জুটবে? খুনটুসি আরো সাতপাঁচ ভাবে। ভাবতে ভাবতে পথ চলে।

হঠাৎ ঘেউ ঘেউয়ের ডাকে ভাবনা ভেঙে যায়, শোন তো বোন, কিসের যেন সোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে না!

খুনটুসি কান দুটো খাড়া করে শুনে বলে, আরে আরে, ওই তো মেসোর গলা শোনা যায়! মেসো যেন চীৎকার করে কি বলছে আর তারপরে সবাই এক সঙ্গে আওয়াজ তুলছে। ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝছি না।

খুনটুসির বুক টিপ ঢিপ করে। ঘেউ ঘেউয়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। ও আর এগোতে চায় না। লেজ নেতিয়ে ওখানেই বসে পড়ে।

এমন সময় ওরা দেখতে পায় একটা বন-বেড়ালী ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। খুনটুসি নিজের জাতভাই দেখতে পেয়ে একটু সাহস পেয়ে ওকে ডাকে, বন-বিল্লী ভাই, বন-বিল্লী ভাই, কোথায় ছুটে যাচ্ছ?

বন-বেড়ালী একটু থমকে দাঁড়ায়। আচমকা কে ডাকে এ বনে! পরখ করে দ্যাখো, ওরই মতো একটা বেড়াল। তবে চেহারাটা কেমন গো-বেচারা, গো-বেচারা

গোছের। ও নিশ্চয়ই মানুষের দেশ থেকে এসেছে।

খুনটুসি ওকে শুধায়, বন-বিল্লী ভাই, বল তো বনে এতো চেঁচামেচি কিসের হচ্ছে?

বন-বেড়ালী জবাব দিলে, ওঃ জান না বুঝি? আর জানবেই বা কিসে? ও আমাদের মিছিল—যাচ্ছে পশুরাজ সিংহের কাছে।

কেন? কেন?—ঘেউ ঘেউ উঠে দাঁড়ায়।

বন-বেড়ালী ঘেউ ঘেউকে দ্যাখে। ওর মনে হয়, কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেত না; উনি আসায় বনের পশু সব এককাট্টা হয়েছে, সাহস পেয়েছে, অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি পেয়েছে।

এমন সময় বনের পশুদের কোলাহল একেবারে কাছেই শোনা যায়। ওরা দেখতে পায়, এক বিরাট মিছিল দূরের জলাটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। খুনটুসি আর ঘেউ ঘেউ জ্বলজ্বলে চোখে সেই মিছিলটা দেখতে থাকে। হরিণ-খরগোশ থেকে শুরু করে সব

......এক বিরাট মিছিল দূরের জলাটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ জীবটা ঠিক ওদের নেকড়ে ভায়ের মতো। বন-বেড়ালী নেকড়েকে একটু সমীহ করে। হাজার হোক ব্যাঘ্র মশায়ের জাত তো? তাই সমীহ-সুরে ঘেউ ঘেউয়ের কথার জবাব দেয়, আর বলবেন না! কী যন্ত্রণায় যে বনে আছি। সিংহ মশায়দের মেজাজ আর কত দিন সহ্য করবে বনের পশুরা? দুর্বল পশুদের তারা এক একজনকে পালা করে খায়। কী এক পশুরাজ হয়ে বসেছেন যে তিনি শুয়ে বসে থেকে মেজাজে সন্ধ্যেবেলা আমাদের একজন করে ভোজন করবেন। এইভাবে তো বনের সব পশু শেষ হতে চলল।

খুনটুসি বললে, তা মেসোমশায়ের গলা শুনছি যে বড়। তিনিও কি মিছিলে আছেন নাকি?

বন-বেড়ালী একটু কাতর স্বরে জবাব দেয়, হ্যাঁ, আজকের মিছিলে তিনিই তো নেতা! আরে ওদের কথা ছেড়ে দিন—সব সিংহদের খয়ের খাঁ। নিশ্চয় ওদের মধ্যে ভাগ নিয়ে কোন গোলমাল হয়েছে। নয়তো এতদিন কিছু বলেন নি কেন? আজ বড়ো সর্দার হয়েছেন!

বন-বেড়ালী একটু থেমে বেশ উৎসাহের সংগে বলে, তবে একটা সুবিধে হয়েছে। আগে তো আর রকমের পশুই সেখানে আছে। বাঘমেসো সবার আগে আগে। তিনি ঘাড়টা একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিক কাত করে আওয়াজ তুলছেন। মিছিলের পশুরা সেই আওয়াজ অনুসরণ করে বন ফাটিয়ে ফেলছে।

বন-বেড়ালী বললে, ওই মিছিল এগিয়ে চলল। আমার হাতে তো সময় নেই। তা তোমরা কি মনে করে মানুষের রাজ্যি ছেড়ে এখানে!

খুনটুসি মিনমিন করে মানুষের অকৃতজ্ঞতা আর অত্যাচারের কাহিনী শোনালে।

বন-বেড়ালী বললে, বেশ করছে ভাই চলে এসে। চল, মিছিলে যাই। এখানে কষ্টেসৃষ্টে মিলে মিশে বেশ চলে যাবে। আর যাই বল, স্বাধীনতা তো থাকবে!

ঘেউ ঘেউ আগে থেকেই কেমন হয়ে গিয়েছিল। এই বন, এই মিছিল আর বন-বেড়ালীর কথা তার ভেতরের আরেকটা শক্তিকে ক্রমশঃ জাগিয়ে তুলছিল। বন-বেড়ালীর কথা শেষ হতেই সে বললে, তাই চল্ বোন, এই ভাল।

খুনটুসি একটা 'মেউ' শব্দ করে ঘেউ ঘেউকে সমর্থন করে লেজ তুলে হাঁটতে শুরু করল।

দুরন্ত ঈগল

• ধারাবাহিক উপন্যাস •

দীননাথ কাশ্যপ

[পূর্বানুবৃত্তি : পামীর-তিয়েনশান গিরিশ্রেণীর পরে দিগন্তবিসারী এক অনুর্বর মহাপ্রান্তর। তার দক্ষিণে উর্বর ফারঘানা উপত্যকার শুরু। পপলার গাছের ঘন অরণ্যে ঘেরা ফারঘানা উপত্যকার এক গ্রাম উচ্-কুরগান। দূরে কিজিল-কী খনি। প্রকাণ্ড খাদ থেকে আকাশে মাথা তোলা চিমনীর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে খনির তিন দিকের অনুচ্চ লাল পাহাড়ে। দুপুরের প্রচণ্ড গরমে পাহাড়ের মাথায় একদল ছেলে এসে জুটেছে যুবক খনি-মজুর ইভাস্কোর কাছে বিপ্লবের পুরনো দিনের কাহিনী শোনার জন্যে। ইভাস্কো বলে যাচ্ছে খুনে দস্যু বাসমাচিদের সঙ্গে লাল কিজিল-কী'র লড়াইয়ের কথা, এমন সময় দূর থেকে একজন উজবেককে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখা যায়। ছেলেরা ছোটে তার পেছনে পাহাড়ের নীচে। স্থানীয় পার্টি-অফিসে এসে ঘোড়সওয়ার সেক্রেটারী ডানিলীচকে একখানা খাম দেয়। বাসমাচি দস্যুদলের কুখ্যাত নেতা তাগাই ইস্ফাইরাম নদী বরাবর নলখাগড়ার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে আর তাগাইকে শায়েস্তা করবার জন্যে আঞ্চলিক বিভাগের ফৌজদার কুজমিন পনেরো জন ভলাণ্টিয়ার পাঠাবার জন্যে লিখেছেন—একথা জানিয়ে ডানিলীচ জানতে চান ভলান্টিয়ার হতে কে কে রাজী। উপস্থিত খনি-মজুররা সবাই সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে—আমি! আমি! আমি! শেষ পর্যন্ত আধ ঘণ্টা পরে যুবক ইভাস্কো তার ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কুজমিনের সঙ্গে গিয়ে সে দেখা করতে, কুজমিন তাকে কোথায় আত্মগোপন করতে হবে দেখিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দেন এই বলে যে, তিনি নিজে গুলি না ছোড়া অবধি সে যেন কখনই গুলি না ছোড়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই ভুলই করে বসে অনভিজ্ঞ ইভাস্কো আর তার আক্কেলসেলামীর মাশুল হিসাবে তাগাই কোণঠাসা অবস্থায় পড়েও অবশেষে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গালা-গাল করে ইভাস্কোর ভূত ভাগিয়ে দেন কুজমিন। ইভাস্কো প্রথমে অবাক হয়, পরে বুঝতে পারে নিজের ভুলের পরিমাণ, আর তীব্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে সে প্রস্তুত হয় সে-ভুলের খেসারত দেবার জন্যে।]

॥ তিন ॥

নিজের কৃতকর্মের ভয়ঙ্কর পরিণাম ইভাস্কোর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ অন্যায়ের প্রতিবিধানের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। পিছু হটার পথ নেই। দরকার হলে সে একাই যাবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে চারজন সংগী নিয়ে ইভাস্কো ঘোড়ার পিঠে রওনা হয় তাগাইয়ের অনুসরণে। কুজ-মিনের বারণ বা হুঁশিয়ারি কিছুই কানে তোলে না। সমস্ত বিপদের ঝুঁকি তাদের।

দুরন্ত ইস্‌ফাইরাম নদী পার হয়ে, পাথরের টিলা, ঢিবি আর পাহাড়ের মাঝ দিয়ে তারা এগোয় পর্বত-এলাকার দিকে। পথ এত সরু যে, দুজন লোকও ঠিক-মতো পাশাপাশি চলতে পারে না। অথচ এ ছাড়া পথও নেই।

সন্ধ্যা নামছে। অত্যন্ত কঠিন দুর্গম পথ। কিন্তু তাদের চলায় বিরাম নেই।

হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে বাসমাচিদের প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো তারা। টিলা ও পাহাড়ের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে বাসমাচিরা ওত পেতে ছিল।

সে রাত ও পরের দিন থেমে থেমে বন্দুকের লড়াই চললো দু পক্ষে।

ইভাস্কোর সংগীদের তিনজন জখম হলো। বাস-মাচিদেরও একজন মারা পড়েছে। তারা পিছু হটলো।

ইভাস্কোর সংগী আছে আর মাত্র একজন। তাকে নিয়েই সে আবার পশ্চাদ্ধাবন করলো বাসমাচিদের। আহত সংগী তিনজন ফিরে গেল।

উচ্-কুরগানে এখন শরতের গরম। কিন্তু পর্বত-রাজ্যের যত উপরে তারা উঠছে, ততই বাড়ছে ঠাণ্ডা।

বরফ—জমাট বরফ সর্বত্র, আর তেমনি শীত। ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যে বরফও ভাঙতে হচ্ছে। দারুণ শীতে নিজেদের অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল। এত কাহিল যে, তাদের হাতে যে বাসমাচিটা মারা পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার গা থেকে গরম জামাকাপড় খুলে নিয়ে তাদের নিজেদের গায়ে চাপাতে হয়েছে।

তাগাইয়ের দল এক সময় কামেন্নী গিরিপথে এসে পৌঁছলো। দলে পনেরজনের মধ্যে আর মাত্র সাতজন বাকী। কিন্তু ওপক্ষে ইভাস্কোর সংগীও হঠাৎ মারা পড়লো মাথায় গুলি লেগে।

সাতজনের বিরুদ্ধে ইভাস্কো একা। নিজের মনে সে বিড়বিড় করতে থাকে,—একশো শয়তানকেও আমি পরোয়া করি নে।

বাসমাচিরা পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেল। আর মৃত বন্ধুকে কবর দেবার জন্যে ইভাস্কো রয়ে গেল পেছনে।

কামেন্নী গিরিপথে তুষার-ঝঞ্ঝার মাতামাতি চলেছে। প্রচণ্ড তুষারপাতে বাসমাচিদের চলার পথের সমস্ত চিহ্ন মুছে গেছে। ইভাস্কোও পথ হারালো। শিকারীদের একখানি কুড়েয় পুরো একটা দিন কাটাতে হলো তাকে।

গিরিশ্রেণী পার হয়ে তাগাই দারাউত-কুরঘান বেড় দিয়ে পুব দিকে চলেছে। সীমান্ত পেরিয়ে আর একবার কাশগড়িয়ায় পালানোর চেষ্টা করাই তার মতলব। কিন্তু হঠাৎ একদল লালরক্ষীর বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে সে পড়লো।

আবার সে পিছু হটলো। এবার সোজা ফিরলো দক্ষিণমুখো—দুর্লঙ্ঘ্য ভয়ংকর পামীরের দিকে।

বাসমাচিদের চলার পথের নিশানা হারিয়ে তুষারাচ্ছন্ন ক্লান্ত অবসন্ন ঘোড়ার পিঠে ইভাস্কো দারাউত-কুরঘানে এসে পৌঁছলো একদিন পরে। নিজেও সে তুষারে আচ্ছন্ন। টলতে টলতে সে গিয়ে ঢুকলো গ্রামীণ সোভিয়েতের সভাপতির ঘরে।

সভাপতিকে দেখেই সে খেঁকিয়ে উঠলো,—কী ব্যাপার! বাসমাচিরা এত কাছে এসে পড়েছে, আর আপনি কিনা বসে আছেন?

আকস্মিক রবাহূত আক্রমণে সভাপতি হকচকিয়ে যান। আগন্তুকের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে শেষে শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন,—বসো, বসো। আগে এক কাপ চা হোক।

কিন্তু ইভাস্কোর তেমনি তিরিক্ষে মেজাজ : চা মানে? মৌজ করে চা খাওয়ার সময় নয় এখন। বাস-মাচিদের এক্ষুণি পাকড়াও করা দরকার।

চেঁচামেচিতে সভাপতি বিব্রত বোধ করেন। চোখ কুঁচকে তিনি তাকালেন ইভাস্কোর দিকে। শেষে সংযত মোলায়েম কণ্ঠে বললেন,—তা, অত চিল্লাছ কেন? সব কিছুই আমরা জানি। শুনবে?

তাঁর কাছ থেকে ইভাস্কো শুনলো, কুজমিনের নির্দেশে কয়েকটি রক্ষীদলকে আগেই পাঠানো হয়েছে তাগাইকে পাকড়াও করার জন্যে। তার আসার আগেই ওরা পৌঁছে গেছে।

তাগাই শেষ পর্যন্ত কিভাবে নিষ্প্রাণ জনহীন ভয়ংকর পামীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, সে কথাও সভাপতি ইভাস্কোকে জানাতে ভুললেন না। বললেন,—

তাগাই যেখানে গেছে, সেখানে না আছে রাস্তাঘাট, না আছে জনপ্রাণী, বসতি। শিকারীরা পর্যন্ত সে এলাকায় আজো ঢুকতে পারেনি।

সবিস্ময়ে ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে,—কোথায় তা?

দেওয়ালে টাঙানো একটা মানচিত্রের দিকে এগিয়ে যান সভাপতি। তার একটা ফাঁকা জায়গায় টোকা মেরে বললেন,—এই এখানে।

কিন্তু জায়গাটা তো সাদা ফাঁকা দেখছি!—হতভম্ব ইভাস্কো প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তাই।—নির্লিপ্ত কণ্ঠে সভাপতি বললেন,—একমাত্র বরফ আর তুষার, মৃত্যু আর হিমেল ঠাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নেই ওখানে।

আর কিছু নেই!—বিমূঢ় ইভাস্কো,—কিন্তু ঐ পথেই বাসমাচিরা যদি চীনে পাড়ি দেয়......

বলতে বলতে একটু ইতস্তত করে সে, তারপর আবার বলে,—নাঃ, এসব কোন কাজের কথা নয়! যেভাবে হোক, ওদের পাকড়াতেই হবে।

কোন দরকার নেই। ওদের মৃত্যু নির্ঘাত।—নিরুত্তাপ কণ্ঠ সভাপতির।

ইভাস্কো ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছে। সে চটে উঠলো,—কিন্তু মনে করুন, তা যদি না হয়? নিশ্চয় করে আপনি কিছুই বলতে পারেন না।

বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল সভাপতির কাছে, নীচু গলায় বললে,—শুনুন, কুর্জমিনের কাছে হলপ করেছি, তাগাইকে জ্যান্ত বা মরা যে কোন অবস্থায় ধরে আনবোই। বুঝলেন?

বু-ঝে-ছি!—টেনে টেনে সভাপতি উচ্চারণ করেন কথাটা। তারপর ছেলেকে ডেকে বললেন,—আইভানকে খবর দে তো। বইপত্র মানচিত্র সব নিয়ে আসতে বলিস্।

ঘরের একদিকে মোটা পশমের পরদা ঝুলছে, দরজা হিসেবে সেটা ব্যবহার করা হয়। তার পেছনে ছেলেটা অদৃশ্য হলো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইভাস্কো তাকিয়ে আছে সভাপতির দিকে। তার চোখে চোখ পড়তে সভাপতি বললেন,—কি, আইভানের পরিচয় জানতে চাইছো? আইভান এখানকার কো-অপারেটিভের হিসাবনবিস। পামীর সম্বন্ধে তার জ্ঞান যথেষ্ট। সব জায়গায় সে গেছে, দেখেছেও সব কিছু। তার সাহায্যেই বাসমাচিদের তিনটে বড় দলকে একসময় আমরা পাকড়াও করেছিলাম।

হিসাবনবিস!—ইভাস্কো যেন আকাশ থেকে পড়ে। উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করতে করতে শেষে একসময় সে বললে,—তার মানে, আপনি কি বলতে চান যে, এই ধরনের কাজকর্মে আপনাকে সাহায্য করছে একজন হিসাবনবিস?

সভাপতি এড়িয়ে গেলেন কথাটা।

বাইরে ঘোড়ার খুরের খটাখট্ আওয়াজ শোনা গেল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলো বেঁটে শীর্ণকায় একজন লোক। তার কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে। ইভাস্কোর আপাদমস্তক সে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

সভাপতি এককাপ চা বাড়িয়ে দেন তার দিকে। কিন্তু ইভাস্কোর তর সইছে না। হিসাবনবিস কাপটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই, ইভাস্কো হঠাৎ ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে কাপটা। সভাপতি তো থ। তারপরেই রাগে ফেটে পড়লেন তিনি,—অ্যাঁ, এটা কি হলো? এ কী ধরনের বেয়াদপি! এর মানে কি?

এখন চা খাওয়ার সময় নয়!—উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে ইভাস্কো জবাব দেয়। পরক্ষণে আইভান হিসাবনবিসের কাঁধ সজোরে চেপে ধরে সে বললে,—খুবই জরুরী ব্যাপার, বুঝলেন! জল্‌দি বলুন, কোথায় কিভাবে বাসমাচিদের নাগাল পাওয়া যায়!

ধাক্কা মেরে ইভাস্কোর হাত সরিয়ে দিলে হিসাবনবিস। তার যা চেহারা, তাতে অত জোর কিন্তু তার কাছ থেকে আশা করা যায় না। ইভাস্কো একটু থতমত খেয়ে গেল।

নীরবে হিসাবনবিস ব্যাগ থেকে বের করলো জীর্ণ দুখানা বই আর কয়েকখানা ম্যাপ। জলবাতাসের স্যাঁতসেঁতে দাগ বই দুখানার সর্বাঙ্গে।

পশমের দরজার গায়ে একখানা ম্যাপ টাঙিয়ে, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ধীরে সুস্থে হিসাবনবিস বললে,—বাসমাচিরা যেতে পারে দু পথে। হয়, তাদের সোজা পর্বত-এলাকায় ঢুকতে হবে, কিন্তু সেখানে না আছে বসতি, না আছে কোন জনপ্রাণী, এমন কি ঘোড়াকে খাওয়ানোর মতো দানাপানিও নেই; তাই মৃত্যু সেখানে অবধারিত। আর না হয়তো তাদের ফিরতে হবে, পড়তে হবে লাল রক্ষীদের হাতে।

কিন্তু আপনি কি করে জানলেন, ওখানে ঐ পর্বত-এলাকায় জনমানব নেই?—ইভাস্কো জিজ্ঞেস করলে।

একখানা বইয়ের ওপর টোকা মারতে মারতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হিসাবনবিস বললে,—এই বইতে লেখা আছে পামীর সম্বন্ধে। সুদূর অতীতে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের কয়েকটা অগ্রগামী বাহিনী ওখান পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু মারা পড়েছিল সবাই।

নির্লিপ্ত উদাসীন কণ্ঠ হিসাবনবিসের। চিবিয়ে চিবিয়ে থেমে থেমে সে বলে চলেছে। ইভাস্কো তাড়া দেয়,—তারপর?

—আলেকজান্ডারের বহু শতাব্দী পরে ভিনিসীয় বণিক মার্কো পোলো অনেক কষ্টে ঐ পর্বত এলাকা পার হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পার হলেও, তাঁর কাফিলার একটা অংশ ধ্বংস হয়েছিল। মার্কো পোলোই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ঐ অঞ্চল সম্পর্কে কিছু লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

বইখানা খুলে হিসাবনবিস পড়তে শুরু করে,—সেখানে, ঐ পর্বতের দেশে দু-চারটে কুড়েঘর এখানে ওখানে দেখা যায়। একদল বুনো পৌত্তলিক সেখানে বাস করে। তারা অত্যন্ত বর্বর। শিকারই তাদের একমাত্র জীবিকা। কাপড়ের বদলে তারা পরে বুনো পশুর চামড়া।...পূবে পথ চলে গেছে পর্বত থেকে পর্বতে। পর্বতের পর পর্বতশ্রেণী। অসংখ্য—আকাশ-ছোঁয়া—ভয়ঙ্কর। যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে হবে, চারপাশের গিরিচুড়োগুলোই বুঝি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ।

আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল হিসাবনবিসের, কিন্তু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিলে ইভাস্কো,—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনি নিজে কখনো গেছেন সেখানে?

না।—হিসাবনবিস বললে,—সেখানে যাইনি বটে, তবে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছি বেশ কয়েকবার।

বেশ। তারপর?—ইভাস্কো তাড়া দেয়।

—সেখানে মানুষ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আগেকার বাসিন্দারা মনে হয় অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বহুকাল পামীর এলাকায় কাজ করেছি। সে সময় এমন একজন লোকের সন্ধান পাই নি, যে ওখান থেকে এসেছে বা ওখানে ঢুকতে পেরেছে। জনপ্রাণীহীন ভয়ঙ্কর ও-জায়গা। লোকে বলে, ওখানে গামোর্ নামে এক ধরনের পর্বতশ্রেণী আছে। বাসমাচিরা সেখানে ঢুকলে নির্ঘাত মারা পড়বে।

হিসাবনবিস থামতেই খনখনে শুকনো গলায় ইভাস্কো বললে,—দেখুন, আপনার কথা আমি বিশ্বাস করেছি, জায়গাটা যে ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ নেই। তবু বলছি, চলুন আমরা দুজনে একসঙ্গে যাই ওখানে। নিজের বরাত আবার যাচাই করে দেখুন না একবার। যাবেন? কোন কাজ একবার হাতে নিলে শেষ না করে আমি ছাড়তে পারি নে।

হিসাবনবিস মাথা নাড়ে। নীরবে ম্যাপগুলো ভাঁজ করে থলি কাঁধে ফেলে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইভাস্কো নির্বাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সভাপতির দিকে।

সভাপতির কপালের ভাঁজগুলো আরো গভীর হয়। শেষে ভ্রূ কুঁচকে বিড়বিড় করে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ঠিক তোমারই মতো আর একজন আছে এখানে।

ছেলেকে তিনি বললেন মুসাকে ডেকে আনতে।

কি ধরনের লোক?—ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে।

—কোজুবে'র বাহিনীর একজন রক্ষী বা পার্টি-জান। জখম হয়ে এখানে চিকিৎসার জন্য এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার নিজের ফৌজে ফিরে যাবে। পার্টিজানরা তাকে বলে 'পাগলা'। কোন কিছুতেই ভয়ডর নেই, জানেরও পরোয়া করে না, যাকে বলে বে-পরোয়া। তেমনি আবার ওস্তাদ ঘোড়সওয়ারও।

মিনিট দশেক পরে দীর্ঘকায় এক কিরঘিজ যুবক ঘরে ঢুকলো। একটা কাঁধ সামনের দিকে বাড়িয়ে এমনভাবে ঢুকলো, যেন ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে মনে হয়। গায়ে ইয়াক বা চমর গরুর হলদে চামড়ার পোশাক, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বুঝি বর্ম পরে আছে। মুখে ছোট্ট একটুখানি কালো দাড়ি আর গোঁফ, আর তার ফলে চেহারায় ভারিক্কী ভাবটা বেশ প্রকট। ডান হাতে কারুকাজ করা কাঠের হাতলওলা চাবুক এক-খানা। ওটা তার সর্বসময়ের সঙ্গী।

সভাপতি তাকে ডাকার কারণ খুলে বললেন।

মুসা সঙ্গে সঙ্গে রাজী। বললে,—ঠিক আছে, আমি যাব। কিন্তু আমিই হবো দলের নেতা।

তার হাবভাব কথাবার্তায় মনে হয়, ইভাস্কো কি বলবে, না বলবে, সেদিকে আমল দেবার দরকার আছে বলে সে মনে করে না।

ভ্রূকুটি করে ইভাস্কো বললে,—কুর্জমিনের নির্দেশে আমি কাজ করছি। সুতরাং আমিই হবো নেতা।

মুসা নির্বাক, নির্বিকার। চোখের পাতাটা পর্যন্ত নড়ছে না।

একটু অপেক্ষা করে ইভাস্কো বললে,—কি, জবাব দাও! তোমার শেষ কথা শুনতে চাই।

পরক্ষণে জবাবের অপেক্ষা না করেই সে টিপ্পনী কাটলে,—অবশ্যি ভয় পেয়ে থাকো তো অন্য কথা।

এবারও মুসা নির্বিকার, একবার শুধু নীরব

দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইভাস্কোর আপাদমস্তক যাচাই করে নেয়।

শেষ পর্যন্ত ইভাস্কো বললে,—ঠিক আছে, আমি একাই যাব।

লম্বাচওড়া বুলি মুসা পছন্দ করে না। ইভাস্কোর দিকে ফিরে সে বললে,—বেশ, আমি যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু কথা রইল, কেউ কারো ওপর মাতব্বরি ফলাতে পারবো না।

বেশ, ভাল কথা।—ইভাস্কো রাজী হয়। দুজনে করমর্দন করে আন্তরিকতার সঙ্গে।

এবার রওনা হবার ব্যবস্থা। মুসা কি যেন ভাবলে ক্ষণকাল, তারপর বললে,—শুনুন সভাপতিমশাই, আপনি বেশ জানেন যে, ঘোড়ার পিঠে জালাই পর্বতশ্রেণী পর্যন্তও যাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যে দরকার ইয়াক—সবচেয়ে ভাল দুটো ইয়াক। এ রকম দুটো ইয়াক আছে আপনার এখানে। কালো শিংভাঙা ষাঁড় একটা, অন্যটাও ষাঁড়—গায়ে ছিটছিট দাগ, নাকচেরা। ঐ দুটো আমাদের দিতে হবে।

কক্‌খনো না!—সভাপতি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন,—অসম্ভব কথা! সারা উপত্যকায় ওরাই সবচেয়ে সেরা ষাঁড়, কিছু দিন আগে সেই মুরগাব থেকে আনা হয়েছে। তোমাদের দিলে হয়তো মারাই পড়বে। আর তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিয়ে মরতে হবে......

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন সভাপতি, ইভাস্কো বাধা দিলে,—আপনি তাহলে ধরে নিয়েছেন, আমরা মারা পড়বো, অর্থাৎ আগেভাগেই আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাখছেন!

বিদ্রূপ ও রাগ ইভাস্কোর কণ্ঠে।

ইভাস্কোকে চোখ টিপে মুসা বললে,—আরে না না, সভাপতিমশাই আমাদের সঙ্গে মস্করা করছেন। বাকী জীবনটা উনি যখন শান্তিতেই কাটাতে চান, তখন ষাঁড় দুটো নিশ্চয়ই দেবেন আমাদের। উনি ভালই জানেন, না দিলে কত ফ্যাসাদ ওঁর। এ ইয়াক দুটো যতদূর যেতে পারবে, অন্যগুলো তা কখনই পারবে না,—এও ওঁর বিলক্ষণ জানা আছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সভাপতি হাত নেড়ে থামিয়ে দেন মুসাকে। ক্ষুব্ধহতাশ কণ্ঠে বললেন,—হয়েছে হয়েছে, রক্ষে করো! তাই হবে। লোকদের বলে দিচ্ছি, ইয়াক দুটোকে ভাল করে বিচালি-ভুসি দিতে আর জিন পরিয়ে রাখতে। এখন যাও, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো গে। আজই শেষ রাত, এর পর তোমরা বোধহয় আর শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না।

পর দিন। ভোরের আলো ফুটতেই ঘোড়ার বদলে ইয়াকে চড়ে ইভাস্কো রওনা হলো বাসমাচিদের পেছনে। ভারী তাজ্জব ঠেকছে তার। তার সামনে প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং। লাগামের বদলে একটা দড়ি দিয়ে জানোয়ারটাকে চালাতে হচ্ছে। দড়িটা গেছে ওর নাকের ভেতর দিয়ে। একই রকমের সুপুষ্ট প্রকাণ্ড আর একটা ষাঁড়ের পিঠে মুসা চলেছে আগে আগে।

ক্রমে ক্রমে তারা আলাই উপত্যকার গভীর তুষার পার হলো। দূরে দেখা যায় জালাই পর্বতশ্রেণী। সেই দিকেই তারা চলেছে। পামীর এলাকা সম্পর্কে মুসা অভিজ্ঞ, কিন্তু ইভাস্কো যে অঞ্চলে চলেছে, সেখানকার পথঘাট তার কাছে অজানা—সম্পূর্ণ নতুন।

তারা স্থির করেছে, জালাই পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত গিয়ে তুজ্‌-সু নদীর কাছে বাসমাচিদের পথের নিশানা খুঁজে দেখবে।

॥ চার ॥

তাগাই ও তার দল শেষ গ্রামখানা পেছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন আগে। পামীরের জালাই পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে চলেছে বেশ কিছুকাল। কোন পথঘাট নেই। ইয়াকের ঘ্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে তারা যাচ্ছে দক্ষিণমুখো।

দুর্গম উত্তুঙ্গ এই পর্বত-রাজ্যের গোলকধাঁধার মধ্যে কোথায় যেন আছে সেই নিঃসঙ্গ গ্রাম মিন-আরখার, ফার ও সোনার গুঁড়ো সংগ্রহের জন্যে যেখানে তাগাই একবার গিয়েছিল বাবার সঙ্গে। বাইরের দুনিয়া সে গ্রামের কোন খবর জানে না। বর্তমানে তারই খোঁজে সে ঘুরছে এই পর্বত-রাজ্যে।

দিনের পর দিন তারা ক্রমেই উপরে উঠছে—উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। শেষে একসময় তারা চিরন্তন তুষারের দুনিয়ায় গিয়ে হাজির হলো। পাতলা ভিজে তুষার সেখানে, পোশাকপরিচ্ছদে জমাট বেঁধে যায়,—চলতে ফিরতে বড় কষ্ট।

কোঁকড়া-কড়া-লোমওলা একটা ইয়াক চলেছে দলের আগে আগে। তাগাই একটা কুকুর কোলে নিয়ে তার পিঠে বসে আছে। তার পেছনে আসছে আর একটা ইয়াক। তুষার-প্রদাহে অসাড় একজন বাসমাচি তার পিঠে। দলের লোকদের রাইফেলগুলোও সব ঐ ইয়াকের

পিঠে চাপানো। লোকগুলোর রাইফেল ধরার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে।

দলে এখন সবসুদ্ধ মাত্র পাঁচজন লোক। বলশেভিক—দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাওয়ায় তাগাই দুজনকে গুলি করে মেরেছে। বাকী বাসমাচি তিনজন ইয়াকের পেছনে আসছে ধুঁকতে ধুঁকতে। নিদারুণ অবসাদে টলছে তারা।

নরম পুরু তুষার ঠেলে এগোনো দুষ্কর। প্রতিটি পদক্ষেপ যন্ত্রণাদায়ক। মাছের মতো হাঁ করে খাবি খাচ্ছে লোকগুলো, তবু শ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস মিলছে না। পিপাসার কষ্টও নিদারুণ। ঠান্ডায় জিভ ফুলে কালো হয়ে গেছে, তবু দুঃসহ পিপাসায় বরফ পর্যন্ত গিলতে হচ্ছে তাদের।

কুকুরটাকে ইয়াক থেকে ফেলে দেবার জন্য তাগাইকে তারা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল, বলেছিল,—কুকুর-টার বদলে আমাদের এক-একজনকে পালা করে ইয়াকের পিঠে বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া হোক।

তাগাই রাগে খেঁকিয়ে উঠেছিল,—তাহলে পাহারা দেবে কে?

এর উপর আর কথা চলে না। নিজের লোকদের উপরও তাগাইয়ের আর আস্থা নেই।

দুদিনের পথ পেছনে বাসমাচিদের পথের নিশানা ধরে ইয়াকের পিঠে আসছে ইভাস্কো আর মুসা।

এ পর্যন্ত তারা দিনের বেলায়ই পথ চলেছে। এর আগে একের পর এক চারটে মরা ঘোড়া পড়েছে তাদের সামনে। পাঁচবারের বার যে মরা ঘোড়াটা পড়লো, তার গা থেকে সমস্ত মাংস কেটে নেওয়া হয়েছে। দেখে, তারা চমকে উঠলো। দিনের বেলায় পথ চলা আর নিরাপদ নয়, বাসমাচিদের নজরে পড়তে পারে, তাই রাতেই পথ চলতে হবে।

তারা নেমে পড়ে ইয়াক থেকে।

ইয়াক দুটো ছাড়া পেতেই পায়ের খুর দিয়ে তুষার আঁচড়াতে লেগে গেছে। সুউচ্চ পার্বত্য তুন্দ্রার তুষার-চাপা শুকনো ঘাস আর জমে-যাওয়া শৈবাল খুঁড়ে বের করছে খাওয়ার জন্যে।

সওয়ার দুজনও শক্ত পাঁউরুটি আর শুঁটকী মাংসের পাতলা-করে-কাটা টুকরো দিয়ে খাওয়া শেষ করলে।

মুসা অবসন্ন হয়ে পড়ছে। বাড়ি ফেরার প্রস্তাব সে একবার করেছিল ইভাস্কোর কাছে। কিন্তু ইভাস্কো আমল দেয় নি। বলেছিল,—সরীসৃপগুলোকে আগে খতম করতে হবে, তারপর ঘরে ফেরার কথা।

একদিন সকালে হঠাৎ তারা দেখে, দূরে এক তুষার-ঢাকা পর্বতচূড়োর কাছে কালো কালো কয়েকটা বিন্দু বরফের ওপর দিয়ে ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। কোন জন্তু-জানোয়ারের সেখানে থাকা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ওরা বাসমাচি।

মুসা সব কাজে প্রথম হতে চায়। তক্ষুণি সে গুলি ছুড়তে গেল। ইভাস্কো বাধা দিলে, বললে,—রাইফেলের পাল্লা থেকে ওরা এত দূরে আছে যে, গুলি লাগবে কিনা সন্দেহ। উল্টে, গুলির আওয়াজে সতর্ক হয়ে যাবে।

দুদিন পরে তারা বাসমাচিদের নাগাল ধরে ফেললে। তখন আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দলটা থেমেছে রাতের বিশ্রামের জন্যে।

রাত্রি গভীর হয়। ইভাস্কো কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে সংগোপনে এগিয়ে গেল বাস-মাচিদের তাঁবুর দিকে।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ইভাস্কো। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। দূরত্ব আর অল্পই বাকি, হঠাৎ তার কানে গেল কুকুরের চিৎকার। থামতে হলো তাকে। নিজের মনে বললে,—কুকুর! ধূর্ত শয়তান! চৌকি দেবার জন্যে কুকুরও একটা সঙ্গে রেখেছে!

আর এগোনো সম্ভব নয়। তুষার-ঢিবির পেছনে আবার ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে ইভাস্কো ফিরে এল মুসার কাছে।

তারা স্থির করে, বেড় দিয়ে ঘুরে সামনে গিয়ে বাসমাচিদের জন্যে আড়ালে ওত পেতে থাকবে।

পরিষ্কার রাত্রি। ঝির ঝির তুষার পড়ছে। ঝুলন্ত হিমবাহের পেছন থেকে চাঁদ উঠলো। হাজার হাজার পাতলা তুষার-ফলক ঝলমল করে উঠলো আগুনের মতো।

এই সেই পর্বত আর এই তার সেই দীপ্ত ঝুলন্ত হিমবাহ, যার অদূরে রয়েছে সেই ভুলে-যাওয়া নিঃসঙ্গ ছোট্ট গ্রাম মিন-আরখার, উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোতেও যার অস্তিত্ব টের পাওয়া দুষ্কর। এরই অদূরে ইভাস্কো আর মুসা গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, ঠিক করলো।

নষ্ট করার মতো তাদের সময় নেই মোটেই। খাদ্যের মজুত শেষ হয়ে আসছে। দিন দিন রোগা আর অবসন্ন হয়ে পড়ছে ইয়াক দুটো। তারা নিজেরাও এত ক্লান্ত যে, সারাক্ষণ শুধু ঘুমুতে ইচ্ছা হয়। পালা করে ঘুমোয় তারা। ঘুমের মাঝে তুষারে জমে যেতে পারে, সেই ভয়ে একে অপরকে প্রায়ই ঘুম থেকে টেনে তোলে।

॥ পাঁচ ॥

আবার দুর্গম পামীরের সেই গ্রাম—ভুলে-যাওয়া ছোট্ট গ্রাম মিন-আরখার।

বাসমাচিদের সঙ্গে জুরার দেখা হওয়ার ও হিমানী-সম্প্রপাত ঘটার আগের দিন। গভীর রাত্রি। সর্দারের গলার আওয়াজে জুরার ঘুম ভেঙে গেল। সর্দারের বড় ভয় অন্ধকারকে। ঘরের বাতি নিবে গেছে। ঝাঁঝালো গলায় সর্দার জিজ্ঞেস করছে মেয়েদের,—ঘরে বাতি জ্বলছে না কেন?

ঘুমজড়ানো গলায় মেয়েরা জবাব দেয়,—তেল নেই।

আবার শোনা যায় সর্দারের তিক্ত কণ্ঠ,—বট্‌টে! তা এত ঠাণ্ডা কেন? চুল্লী নিবে গেছে। কয়লাও কি নেই? কুড়ের বাদশা হতভাগা কুচাকটা কি আবারও বেগার দিয়েছে?

নিজের কুঠরির মেঝেয় নিস্পন্দ বসে আছে কুচাক। গোল কাঁধের দু পাশ থেকে রোমশ দুই হাত নেমে এসেছে। ধোঁয়া বেরোবার ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। এমনি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে।

সকালে জুরা এল তার কাছে, বললে,—বেরোতে হবে।

কুচাকের নড়ার ইচ্ছে নেই, কেঁউ কেঁউ করে উঠলো, —না, আমি বেরোতে পারবো না। তবিয়ৎ ভাল নেই।

জুরা রুখে উঠলো,—বটে! বয়সের মরদ তুমি, মেয়েরা যা পারে, তাও করতে চাও না। শুধুই ফাঁকি, কয়লাটা পর্যন্ত আনতে পার না। আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাচ্ছি, ব্যবস্থা করছি শরীর যাতে ভাল হয়!

সঙ্গে সঙ্গে কুচাক উঠে দাঁড়ালো। জুরার তিরিক্ষি মেজাজ ও রাগকে সে চেনে। বললে,—না না, আর ব্যবস্থার দরকার নেই। শরীরটা এখন বেশ ভালই ঠেকছে। চলো।

দুজনে বেরিয়ে পড়ে।

উঁচু খাড়া পর্বত, ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে একেবারেই ন্যাড়া। তার এক ফাটল দিয়ে অবিরাম 'তেল' চুইয়ে পড়ছে—তেল অর্থাৎ পেট্রোল। জুরা ও কুচাক সঙ্কীর্ণ গিরিখাত বেয়ে ওপরে উঠে ফাটলটার নীচে এক চামড়ার থলি পাতলে 'তেল' ভর্তি করার জন্যে।

এবার কয়লার ব্যবস্থা। পর্বত-ঢালের নীচে এক জায়গায় মাটির তলা থেকে কয়লা ওপরে উঠে এসেছে। গাঁইতি দিয়ে তারা কিছু কয়লা কেটে তুললো ছোট খাদটা থেকে। মেয়েরা এসে তা ঘরে নিয়ে গেল।

ওদিককার কাজ শেষ হতে, জুরা এল নিজের ছোট্ট কামারশালায়। সঙ্গে কুচাক। দিনের বাকী সময়টা তার প্রায় সেখানেই কেটে যায়।

এক খণ্ড লোহা দিয়ে সে ছোরা তৈরি করছে। কুচাক হাপর টেনে চুল্লির আগুনে বাতাস দিচ্ছে, আর আগুনের মতো টকটকে লাল ছোরাটায় কারুকাজ করছে জুরা!

হাপর টানতে টানতে কুচাক এক সময় বললে,—কি হচ্ছে বলতে পার? এত কারুকাজ কিসের জন্যে?

জুরা বললে,—কেন নয়? ইর-মানাসও তো সব সময় কারুকাজ-করা ছোরা ব্যবহার করতেন।

—তা জানি। কিন্তু ইর-মানাস তো খুব বড় বীর যোদ্ধা ছিলেন। আর তুমি?

আমিও তাই,—ভারিক্কি গলায় জুরা জবাব দেয়,—এক হাত দিয়েই তোমায় আমি পেড়ে ফেলতে পারি। কৌমিস (টকানো দুধের পানীয়) আর মাংস খেতে পারি সবার চেয়ে বেশী। আমায় ভয় আর সমীহ করে চলে সবাই।

কুচাক ঘাড় নাড়ে, নিজের চোপসানো পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—উঁহু, আমার ধারণা, তোমার চেয়ে আমি বেশী খেতে পারি। কিন্তু সে কথা থাক, তা এ পর্যন্ত কতজন দুশমনকে তুমি ঘায়েল করেছ?

করিনি, করবো।—রাগতকণ্ঠে জুরা বললে।

দেখতে দেখতে তর্ক বেধে গেল। উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি চলেছে দুজনের মধ্যে, এমন সময় কুচাক হঠাৎ জুরার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বাবুর দিকে।

কালো রঙের প্রকাণ্ড শিকারী মাদী কুকুর বাবু—বলের মতো গোল হয়ে শুয়ে আছে। কাটা লেজের গোড়াটা বারবার উঠছে, শক্ত হচ্ছে। বাবু ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ তার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠলো। উঠে বসলো সে। কামারশালার বাইরের দিকের দেয়ালটা এক তুষার-ঢিবির গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাবু সেদিকে ঘাড় ফেরায়। রাগে ও উত্তেজনায় তার ওপরের ঠোঁট গুটিয়ে গেছে। ভয়ংকর দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো সে।

কী ব্যাপার! সে কি কোন দুশমনের গন্ধ পেয়েছে?

চকিতে বাবু উঠে দাঁড়ায়। এক লাফে দেয়ালের ওপর উঠে মাথা নীচু করে কি যেন শোনবার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে সমানে চলে তার মৃদু গর্‌গর্‌ গর্জন।

গর্জন অতি মৃদু ও অস্পষ্ট হলেও তা গাঁয়ের আর সব কুকুরের কানে যায়। শুরু হয় তাদের ক্রুদ্ধ বেপরোয়া চিৎকার।

সন্দেহজনক কোন শব্দ আসে কিনা, জুরা ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু না, কোন কিছুই কানে আসছে না। তবুও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এমন অনেক শব্দ আছে যা মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব না হলেও, বাবুর মতো কুকুরের কান এড়ায় না। তাড়াতাড়ি সে ছাদে গিয়ে উঠলো, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালো বাইরের দিকে।

সব দিকেই আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী—তুষারমৌলী সুউচ্চ গিরিপ্রাচীর। গাঁয়ে আসার পথ দুটো। একটা পশ্চিম থেকে—পর্বতের খাড়া দেয়ালে ফাটলের মাঝে মাঝে কাঠ আর পাথর দিয়ে সেটা তৈরী। সে পথে আসতে হলে খাড়া দেয়ালে বুক লাগিয়ে, দেয়াল থেকে যেসব পাথর বেরিয়ে আছে সেগুলো আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে উঠে আসতে হয়। দ্বিতীয় পথটা দক্ষিণ থেকে—খাড়াইয়ের ওপারে গিরিখাত ধরে।

তুষারে ঢাকা পথ দুটোয় কোন মানুষই জুরার নজরে পড়ে না।

তার সঙ্গে বাবুও ছাদে উঠে এসেছিল। বাবুকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় সে বললে,—দূর হতভাগী! মিথ্যে বিপদের সঙ্কেত দিয়েছিস্।

বাবুর কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য নেই। কান খাড়া করে সে উত্তর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে উত্তর দিকে তাকাতেই জুরা চমকে উঠলো। গ্রামের প্রান্তে যে পর্বতশ্রেণী, তার তলায় আসার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরের দুর্লঙ্ঘ্য খাড়াই। নিদারুণ বিস্ময়ে জুরা দেখলে, উত্তরের সেই পর্বতের নীচে কালো কালো কতকগুলো বিন্দু নড়াচড়া করছে।

কি করে সম্ভব হলো এটা? পরক্ষণে তার মনে পড়ে, মাসখানেক আগে যে হিমানী-সম্প্রপাত ঘটেছিল, তাতে তুষারের একটা সেতু তৈরী হয়েছিল খাড়াইয়ের ওপর দিয়ে, আর তার ফলে উত্তর থেকে গাঁয়ে ঢোকার পথও একটা তৈরী হয়েছিল সে সময়।

সবচেয়ে কাছের কুঠরিটার ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে জুরা তীব্রকণ্ঠে হাঁক ছাড়লে ঃ হুশিয়ার! হুশিয়ার!

মুহূর্তে সারা গাঁ সচকিত হয়ে উঠলো। সবচেয়ে উদ্বিগ্ন হলো বুড়ো সর্দার। শীতের সময় আজ অবধি কেউ কখনো এ গাঁয়ে আসেনি। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা গ্রামখানাকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

কুকুরের চিৎকার থামতে, জুরা পুরনো এক ম্যাচলক গাদা বন্দুক নিয়ে রওনা হলো উত্তরের পর্বতের দিকে। পর্বতটাকে বলা হয় 'বরফমুকুট'। আগন্তুকেরা তারই তলার দিকে আসছে।

জুরা প্রথমে ভেবেছিল, সোজা যাবে আগন্তুকদের দিকে। কিন্তু শিকারীর সহজাত সতর্ক বুদ্ধির কাছে নিছক কৌতূহল বাধা পায়। সে ঠিক করলে, লুকিয়ে থেকে আগন্তুকদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবে। বরফমুকুটের পায়ের কাছে ছোট চুড়োটার দিকে রওনা হয় সে। চুড়োটার মাথায় যে সব টিলা ও পাথরঢিবি আছে, তার পেছনে লুকিয়ে থেকে সে রবাহূত লোক-গুলোর ওপর নজর রাখতে পারবে।

বাবু নীরবে আগে আগে উঠছে চুড়োর মাথায়। মনিবের জন্য থামছে মাঝে মাঝে। আর কাটা লেজটা নাড়ছে অধীর আগ্রহে। তার যেন তর সইছে না।

জুরাকে উঠতে হচ্ছে অতি সাবধানে। একটি মাত্র অসতর্ক পদক্ষেপ মানে সব শেষ, অতলস্পর্শী খাদে গিয়ে পড়া।

অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এক পা এক পা করে শেষ পর্যন্ত সে মাথায় গিয়ে উঠলো।

চুড়োর মাথায় টিলা ও ঢিবিগুলো থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে সে তুষারের ওপর দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে যায়। এমন একটা জায়গা বেছে নিতে হবে, যেখান থেকে সব দিকে নজর রাখা ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

হঠাৎ বাবু পিছু হটে এল। ক্ষিপ্র বেগে ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো নিশ্চলের মতো।

জুরা অবাক। কি ব্যাপার! লোকগুলো এর মধ্যেই পর্বতের মাথায় উঠবে, এটা কখনই সম্ভব নয়। পর্বতটা বেড় দিয়ে বাঁ দিকে যাবার জন্য সে রওনা হয়। কিন্তু চুড়োর উত্তর দিকে কেবল গিয়ে পৌঁছেচে, এমন সময় নীচে বরফমুকুটের তলা থেকে হঠাৎ ভেসে এল এক অপরিচিত কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকার।

ঘুরে তাকাতেই, নীচে পর্বতটার পাশে পাঁচজন লোককে দেখতে পেল সে—কালো বিন্দুগুলোকে প্রথম যেখানে দেখেছিল, তার থেকে বেশী দূরে নয়। গাঁটরি থেকে তারা চটপট রাইফেল বের করছে।

জুরা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করলে। কিন্তু ওরা তাকে দেখে ফেলেছে।

জুরা তাকালে বাবুর দিকে। ওর ব্যাপারটা কি? তখনো সে একদৃষ্টে উল্টো দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এর অর্থ বুঝতে জুরার দেরি হয় না। অর্থাৎ

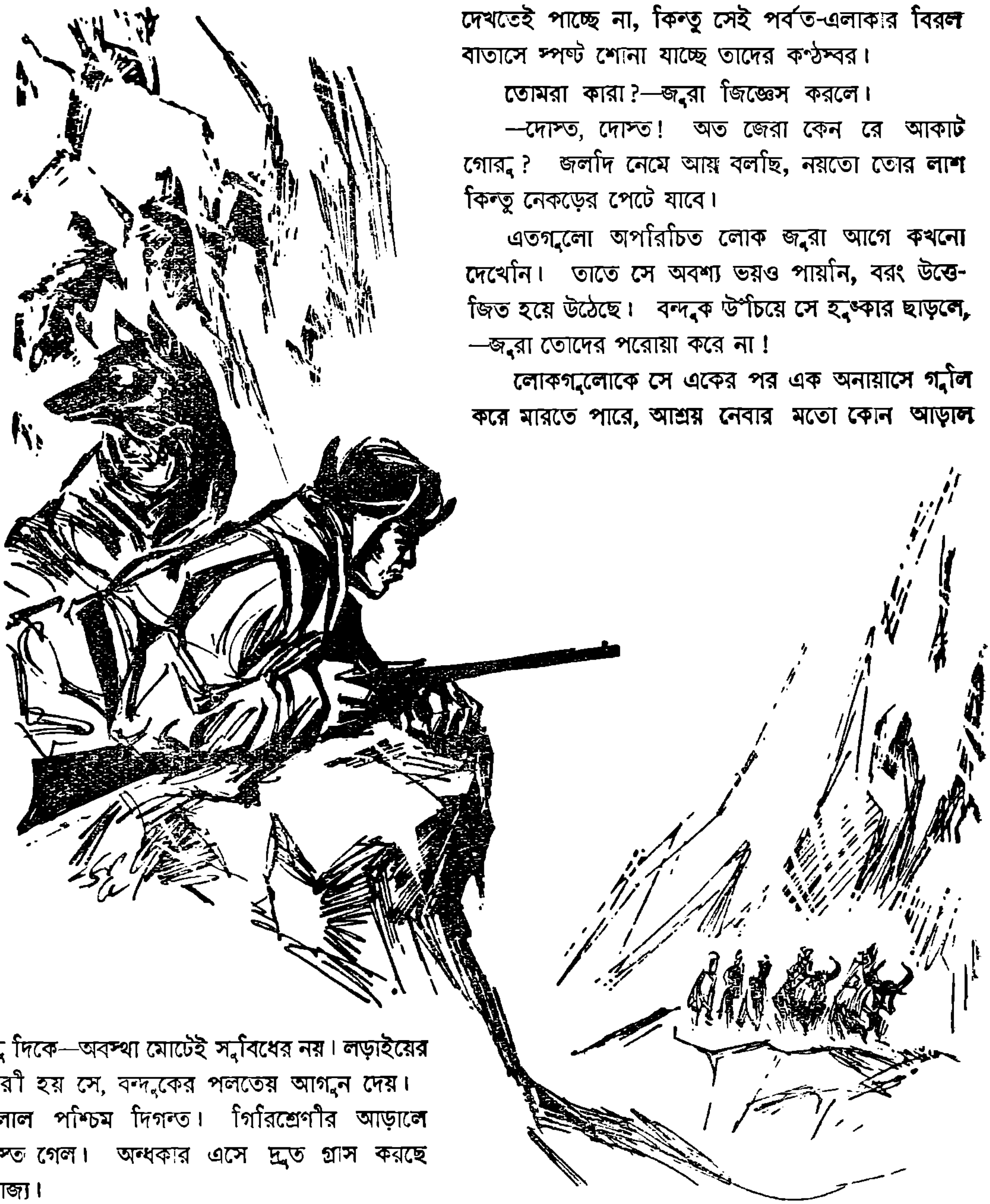

বিপদ দু দিকে—অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয় সে, বন্দুকের পলতেয় আগুন দেয়।

রক্তলাল পশ্চিম দিগন্ত। গিরিশ্রেণীর আড়ালে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার এসে দ্রুত গ্রাস করছে পর্বত-রাজ্য।

দূর থেকে এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—কে রে তুই ওখানে?

আমি জুরা।—সগর্ব জবাব দেয় শিকারী।

নেমে আয়, নয়তো গুলি করবো!—তাগাইয়ের দলের একজন বাসমাচি খেঁকিয়ে উঠলো।

আকাশস্পর্শী সেই পর্বতরাজ্যে বাতাস বড় সূক্ষ্ম—পাতলা ও হালকা। বাসমাচিরা জুরাকে বলতে গেলে, দেখতেই পাচ্ছে না, কিন্তু সেই পর্বত-এলাকার বিরল বাতাসে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর।

তোমরা কারা?—জুরা জিজ্ঞেস করলে।

—দোস্ত, দোস্ত! অত জেরা কেন রে আকাট গোরু? জলদি নেমে আয় বলছি, নয়তো তোর লাশ কিন্তু নেকড়ের পেটে যাবে।

এতগুলো অপরিচিত লোক জুরা আগে কখনো দেখেনি। তাতে সে অবশ্য ভয়ও পায়নি, বরং উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বন্দুক উঁচিয়ে সে হুঙ্কার ছাড়লে,—জুরা তোদের পরোয়া করে না!

লোকগুলোকে সে একের পর এক অনায়াসে গুলি করে মারতে পারে, আশ্রয় নেবার মতো কোন আড়াল তাদের নেই। কিন্তু সে যেখানে আছে, সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে হিমানী-সম্প্রপাত থেকে নিস্তার পাওয়া প্রায় অসম্ভব হবে। একাধিকবার সে দম বন্ধ করে, হাঁচি-কাশি চেপে নিঃশব্দে ছায়ার মতো খাড়াইগুলোর তলদেশ পার হয়ে এসেছে। খাড়াইগুলোর ওপর থেকে তুষার ও বরফের বিশাল বিশাল রাক্ষুসে স্তূপ শূন্যে ঝুলে আছে নীচের দিকে।

বাতাসে বিন্দুমাত্র আলোড়ন ঘটলেই তারা সোজা নীচে ভেঙে পড়বে।

বন্দুকের পলতের আগুন সে নিভিয়ে ফেললে।

বাবু রাগে গর্‌গর্‌ করছে। তার দিকে ফিরতেই জুরা আবার চমকে উঠলো। খাড়া পর্বতটার ঢিবি-গুলোর পেছন থেকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এসেছে দুজন লোক। ইভাস্কো আর মুসা। পিছু হটার পথও বন্ধ।

নীচে থেকে আবার কতকগুলো খনখনে শুকনো গলার ঐকতান ভেসে এল,—এই শুনছিস, কি হলো রে! তোর জন্যে আমরা কি জিন্দিগি ভর বসে থাকবো?

জুরা ইতিমধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। দু পক্ষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে।

শিস দিয়ে সে সংকেত করে বাবুকে। পরক্ষণে বন্দুক পিঠে ফেলে ইয়াকের লোমশ চামড়ার লম্বা কোটের দুই প্রান্তভাগ জড়িয়ে নিয়ে সে বসলো শক্ত তুষারের ওপর। তারপরেই বাসমাচি থেকে দূরে উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করলে—প্রথমে ধীরে, তারপর জোরে, আরো আরো জোরে।

ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে জুরা নামছে। নামার খস্‌খস্‌ মৃদু শব্দ শুধু। তুষারে ঢাকা ঢালু দিকটা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। কানের মধ্যে বাতাস বাঁশীর মতো শব্দ করছে। ধাক্কা খেতে খেতে, পাক খেতে খেতে দুরন্ত বেগে গড়িয়ে নামছে সে নীচের দিকে। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো,—সর্বনাশ! সে নামছে ডান দিকে, যে দিকে বাসমাচিরা আছে। অথচ তাকে যেতে হবে বাঁ দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে মোড় নেবার জন্যে সে শক্ত তুষারের মধ্যে জোরে গোড়ালি বসিয়ে দিলে। ওপর থেকে তুষারের পর তুষারের বিরাট বিরাট স্তূপ ভীমবেগে নীচের দিকে নেমে আসে। তাদের মধ্যে পড়ে ঘূর্ণির মধ্যে ধুলোকণার মতো পাক খেতে খেতে জুরা গড়িয়ে পড়তে লাগলো নীচের দিকে।

মাথায় তখন তার একমাত্র চিন্তা—শেষে তুষারের তলায় কবর না যাই। দুহাত ছুড়তে থাকে সে, তুষার-স্তূপকে যেন ঠেলে ফেলতে চাইছে। কানের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে গর্জন।

শেষে এক সময় ধাক্কা খেয়ে তার গতি রুদ্ধ হলো।

ধস-নামা তুষারের এক বিরাট ঢিবির মধ্যে কিছুক্ষণ সে পড়ে রইল আচ্ছন্নের মতো। অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধীরে ধীরে আবার সাড়া ফিরে আসে। সে উঠে বসে এক সময়। দুই বাহু দ্রুত ভাঁজ ও সোজা করতে থাকে বারবার। তারপর টলতে টলতে এক সময় উঠে দাঁড়ালো।

বাসমাচিরা তাকে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। ধরে নিয়েছিল, পা ফসকে নীচে পড়ে সে মারা গেছে।

ইতিমধ্যে চাঁদ উঠলো। ঝলমল করছে গিরিশিখর। বাসমাচিরা দেখলে, অক্ষতদেহে জুরা এক তুষার-ঢিবির ওপর বসে আছে। জুরার সঙ্গে ছোটখাট যে হিমানী-সম্প্রপাত নেমেছিল, তারই ফলে তৈরী হয়েছে ঢিবিটা।

রাইফেল উঁচিয়ে বাসমাচিরা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—জলদি নেমে আয় বলছি, নয়তো...

জুরা ছুটলো টিলাগুলোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাসমাচিদের রাইফেল গর্জন করে উঠলো। এলো-পাথাড়ি গুলি ছুড়ছে তারা।

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে ছুটতে জুরা ভাবে,—সর্বনাশ! সর্বনাশ!

তারপর...

তুষারমৌলী হিমগিরি যেন ভ্রূকুটি করে উঠলো। গিরিচূড়ায় ঘনিয়ে এল অন্ধকার। তুষারের মেঘ উঠলো বাতাসে। শুরু হলো গুড়্‌গুড়্‌ গর্জন। তারপরেই বজ্রনির্ঘোষ। দুরন্ত ঝঞ্ঝার এক ঝাপ্‌টা এসে জুরাকে পালকের মতো ছুড়ে ফেললে এক দিকে।

পরক্ষণে হিমগিরি থেকে নেমে এল মহাভয়ঙ্কর এক হিমানী-সম্প্রপাত, তুষারপর্বতের ধস। নামার পথে সবকিছু চুরমার করে নিশ্চিহ্ন করতে করতে সোজা তা ভেঙে পড়লো আতঙ্ক-বিহ্বল দিশেহারা বাসমাচিদের ওপর। তারপর......

জুরা ফিরে গেল গাঁয়ে—ছাদের ওপর প্রতীক্ষারত বৃদ্ধ সর্দার ইস্কান্দারের কাছে। [ক্রমশঃ]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরু-চরিত অবলম্বনে • শিল্পী : শৈল চক্রবর্তী

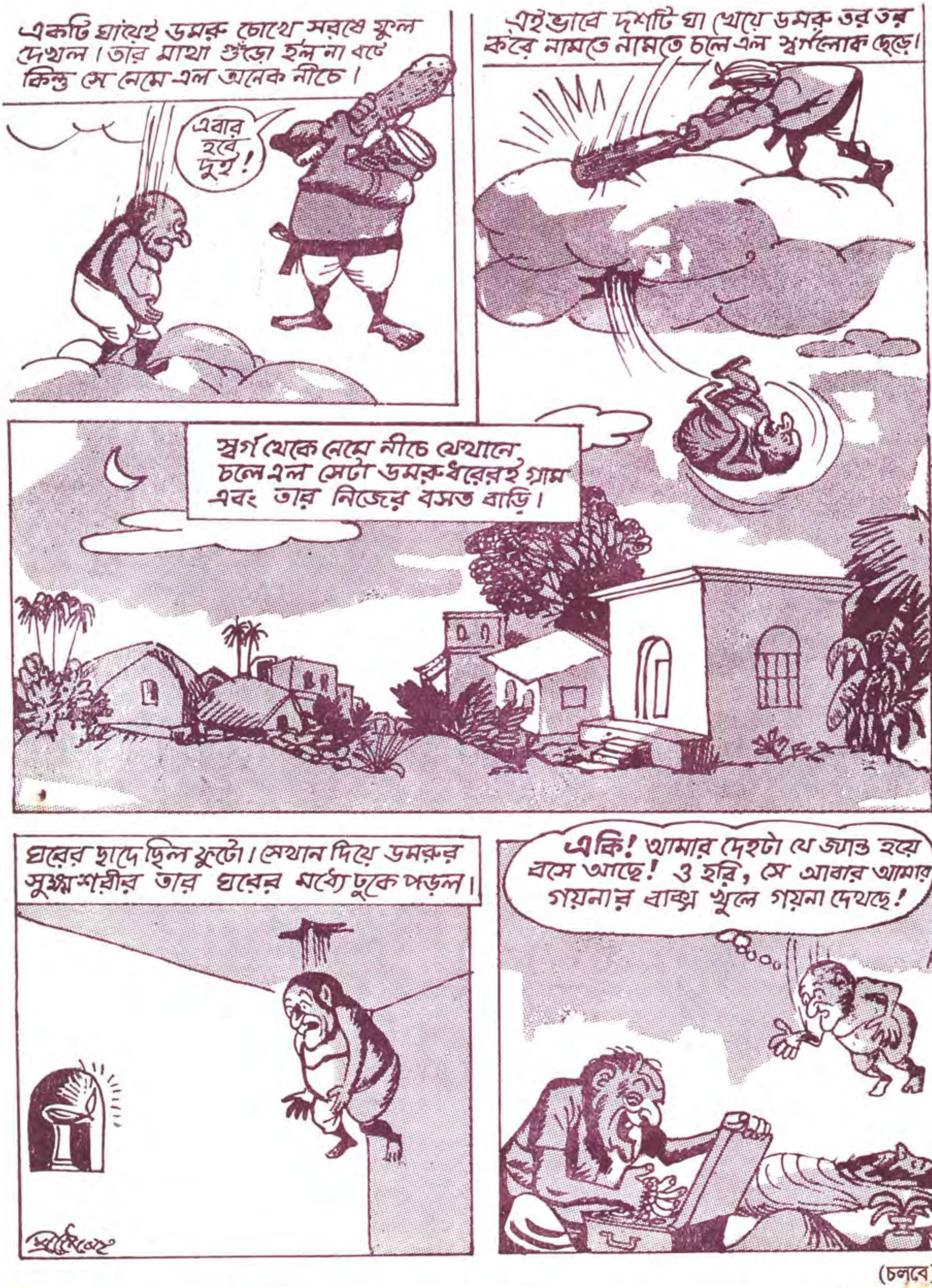
একটি ঘায়েই ডমরু চোখে সরষে ফুল দেখল। তার মাথা গুঁড়ো হল না বটে কিন্তু সে নেমে এল অনেক নীচে।
এবার হবে দুই!
এইভাবে দশটি ঘা খেয়ে ডমরু তর তর করে নামতে নামতে চলে এল স্বর্গলোক ছেড়ে।
স্বর্গ থেকে নেমে নীচে যেখানে চলে এল সেটা ডমরুধরেরই গ্রাম এবং তার নিজের বসত বাড়ি।
ঘরের ছাদে ছিল ফুটো। সেখান দিয়ে ডমরুর সুক্ষ্মশরীর তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।
একি! আমার দেহটা যে জ্যান্ত হয়ে বসে আছে! ও হরি, সে আবার আমার গয়নার বাক্স খুলে গয়না দেখছে!

(চলবে)

ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

নীল-ঝিল্‌মিল্‌ আকাশ জুড়ে
মেঘের ভেলা ভাসে,
লক্ষ হীরে মানিক জ্বলে
সবুজ ঘাসে ঘাসে!

কাশের বন দুলিয়ে দিয়ে
বাতাস নেচে যায়,
ঝুর্‌-ঝুর্‌-ঝুর্‌ শিউলি ঝরে
ভোরের আঙিনায়!

রঙীন প্রজাপতির নাচন
বনের ফাঁকে ফাঁকে,
নদীর পারে হিজল শাখে
উদাস ঘুঘু ডাকে।

সে ডাক শুনে খেয়াল-খুশী
মেঘের মত ভেসে
ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে
রূপকাহিনীর দেশে!

আজ শরতের বাঁশী বাজে
কাজ-ভোলানো সুরে—
লক্ষ মনের খুশির রঙ
সোনালী রোদ্দুরে॥

ঘুম ভাঙানো ভোর

বিভূতি ভট্টাচার্য

ঘুম ভাঙানো ভোর এসেছে
ঘুম ভাঙানো ভোর—
ঘুম ভাঙানো ভোর এসেছে
খোল্‌ না রে খোল্‌ দোর।
চাঁদ চলেছে নীল আকাশে
তারাগুলোর রঙ ফ্যাকাসে
ভয়ে ভয়ে সবাই ওরা
ছুট্‌ছে বেজায় জোর।
ঘুম ভাঙানো ভোর।
ডানা মেলে রঙিন পাখী
করছে সবাই হাঁকাহাঁকি
লুকিয়ে শোনে শুকতারা তাই
মস্ত যেন চোর
ঘুম ভাঙানো ভোর।
সবুজ পাতার ফাঁকে গিয়ে
আঁধার কাঁপে থরথরিয়ে
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভাঙে
ধরার ঘুমের ঘোর
ঘুম ভাঙানো ভোর।
ফুল যে করে 'ফুটি ফুটি',
সূর্য বলে 'উঠি, উঠি,'
হোলির দিনের রাঙা আবীর
আকাশ মাঝে ঘোর
ঘুম ভাঙানো ভোর।

উত্থান

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

আজি দুর্যোগে ঝঞ্ঝার রাতে আমরা তুলেছি শির
আমরা তুলেছি সবুজ কন্ঠে সংগীত প্রভাতীর।
আমরা চলেছি শান্তির পথে
বিশ্বহিতের সুমহান ব্রতে—
আমরা নিয়েছি কঠিন শপথ সংকট মুক্তির।
আজি দুর্যোগে ঝঞ্ঝার রাতে আমরা তুলেছি শির॥

আমরা জেগেছি সূর্যের মতো নিদ্রিত পৃথিবীতে
হতাশা-কাতর ক্লান্ত মনের সুপ্তিকে ভেঙে দিতে।
মহামানবের চির আগমনী
চির নতুনের চির জাগরণী—
আমরা এসেছি শিকল ভাঙতে নিপীড়িত বন্দীর।
আজি দুর্যোগে ঝঞ্ঝার রাতে আমরা তুলেছি শির॥

বিয়ের ভোজ

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

কন্ধকাটার ব্যাটার সাথে
শাঁকচুন্নীর বিয়ে—
ভোজ যা হল বলব কী যে
না হয় চেখে দেখ না নিজে
ছুঁচোর মাথার ঘিলু ভাজা
হিঙে পালং দিয়ে।
নেংটি ইঁদুর কাবাব সাথে
কচুপোড়ার ঘণ্ট
থুমথুমাথুম্ নাচবি খেলেই
মজবে তোদের কণ্ঠ।
হুলোর ল্যাজ আর হাতীর মুড়ো
বেসন দিয়ে ভাজা
চামচিকে-চপ্ খা গপাগপ্
এই তো ভোজের রাজা!
আমড়া দিয়ে ভিনিগারে
সদ্য রাঁধা পায়েস
খা রে লুটে চেটেপুটে
করবি কেন আয়েস?
তাই তো বলি আনন্দে ভাই
গোঁফ ডুবিয়ে খা
খেতে খেতে এক্কেবারে
যমের বাড়ি যা।

বুদ্ধি-চুরি

কালিদাস ভট্টাচার্য

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে
চাদর দিয়ে গায়,
মস্ত খাটে শুয়ে দাদু
আরামে ঘুম যায়।

একনাগাড়ে বাঘের মত
ডাকছে দাদুর নাক,
তেলচুক্‌চুক্ করছে দাদুর
মস্ত বড় টাক।

দাদুর মাথার টাকটি খোকন
একটি হাতে ঘষে,
নিজের মাথে ঘষছে সে হাত
চুপটি করে বসে।

দিদা এসে বললো হেসে—
"করিস কিরে খোকা?"
খোকন বলে, "তোমরা আমায়
সবাই বল বোকা,

আস্ত বোকা আজ বলেছে
আমায় ছোট খুড়ি,
দাদুর মাথার বুদ্ধি যে তাই
করছি বসে চুরি!"

বর্ণপরিচয়ের লেখককে!

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর
দয়ার সাগর লোকে তোমায় বলে
তাই তোমাকে চুপি চুপি মনের কথা কই,
একটু সহজ করে কেন লিখলে না গো বই?
সহজ করে লিখলে কিছু হ'ত কি গো ভুল?
কঠিন কঠিন বানান ভরা বর্ণপরিচয়
পড়তে বসে চোখে দেখি শুধু সর্ষেফুল!
'ব ফলারা' জড়িয়ে ধরে, লাগে ভীষণ ভয়।
'বিজিগীষা' বানান আমায় জ্বালায় প্রতি পলে
'জাড্য' বানান করতে গিয়ে ভাসি চোখের জলে
'বৃশ্চিক' আর 'উষ্ট্র' এবং 'দংষ্ট্রা' আছে সাথে
'মর্কটেরা' পিছু ধাওয়া করছে দিনে-রাতে।
'রাখাল বড় দুষ্টু ছেলে' পালায় সে ইস্‌কুল
রোজ হরতাল বলে কেন পাঠশালা দেয় ফাঁকি
সন্ধ্যেবেলায় ঘুমে দু'চোখ কেন যে ঢুলু ঢুলু
দয়ার সাগর এ সব খবর তুমি রাখো না কি?
সকাল দুপুর শাসন ভীষণ দ্যাখো না কি তাও?
ফটোর থেকে নেমে এস, দেখতে যদি চাও॥

সদা সত্যকথা বলিবে!

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিদাসের জীবনের সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা!...... কবে সেই ছোট্ট বেলায় গাঁয়ের পাঠশালে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে পড়েছিল—

সদা সত্য কথা বলিবে!......

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের লেখা দ্বিতীয় ভাগের পাতায় লেখা আছে কথাটা। কয়েকটি শব্দের সমষ্টি। কিন্তু সেই শব্দগুলো এক-একটা ধারালো ছুরির মতো তার মনে বিঁধে আছে আজও। ভুলতে পারেনি।

পণ্ডিত মশাই টিকি দুলিয়ে ডাঁটি ভাঙা চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে বলেছিলেন—যাহা পড়াইলাম কিছু বুঝিলে?

ছোট্ট শিশুর দল হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তখন। এর মধ্যে নতুন করে বুঝবার কী আছে! তবে একটি শব্দের অর্থ তারা বুঝতে পারেনি—সেটি হলো ঐ 'সদা' শব্দটি। এর অর্থ তাদের জানা নেই।

হরিদাসই মুখটা কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞেস করেছিল পণ্ডিত মশাইকে—পণ্ডিত মশাই, 'সদা' মানে কি?

পণ্ডিত মশাই যেন ক্ষেপে উঠলেন—গর্দভ! ইহাও তোমাদের জানা নাই?

সবার মুখের দিকে তিনি তাকালেন।

কিন্তু কেউই ঐ শব্দটির অর্থ বলতে পারে না।

পণ্ডিত মশাই এতক্ষণে বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। সত্যিই তো, এইসব কচি শিশুদের পক্ষে 'সদা' শব্দটির অর্থ জানা তো সম্ভব নয়। ভুল তো তাঁরই।

এ যুগের শিক্ষকেরা নিজেদের ভুল স্বীকার করতে লজ্জা পান। এবং শুধু শিক্ষকেরাই নন—এ যুগের কোন মানুষই নিজের ভুল স্বীকার করতে চান না। নানান যুক্তি দিয়ে নিজের ভুলটিকে খাঁটী প্রমাণ করার জন্যে অহিংস সংগ্রাম শুরু করেন।

কিন্তু পণ্ডিত মশাই সে-যুগের মানুষ। খাঁটী যুগের খাঁটী মানুষ! সে-যুগের দোকানী ঘিয়ে দালদা মেশাতো না, সরষের তেলে শিয়ালকাঁটা ছিল না, পেঁপের বীচিকে গোল মরিচের দানা বলে দোকানদার বিক্রি করতো না আর ডাক্তারবাবুও রুগীকে হাতে রাখার জন্যে রঙিন জল মিকশ্চার বলে চালাতেন না!......

পণ্ডিত মশাই ছিলেন সেই যুগের মানুষ।

তিনি ছাত্রদের সামনে নিজের দোষ স্বীকার করলেন—হাঁ, তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। এই শব্দের অর্থ তোমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। দোষ আমারই হইয়াছে। বিরক্তি প্রকাশ করা আমার শোভন হয় নাই।

পটলা পণ্ডিত মশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন তুলে ধরলো—'শোভন' শব্দটির অর্থ কি পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত মশাই সব সময় সাধু ভাষায় কথা বলেন। মুশকিল হয়েছে সেখানেই।

তিনি সেদিন পটলার প্রশ্নে খুশীই হয়েছিলেন। দন্তবিহীন পানের ছোপে রাঙা মাড়িগুলো বের করে খুশীর হাসি হেসে বললেন—সব শব্দের অর্থই তোমাদের বুঝাইয়া দিব! তোমাদের জানিবার আগ্রহ দেখিয়া আমি খুবই প্রীত হইয়াছি।

এবার সরাসরি দুদিক থেকে দুটি প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হলো পণ্ডিত মশায়ের ওপর—

'আগ্রহ' মানে কি পণ্ডিত মশাই?

'প্রীত' মানে কি?

পণ্ডিত মশাই এবার দারুণ ফাঁপরে পড়লেন।

কিন্তু ছেলেদের কোন দোষ নেই। তারা জানতেই চায়। তাদের আগ্রহকে, জানার ইচ্ছাকে তিনি দমন করতে চান না। একে একে সেদিন তিনি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থই তাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

এর পর তিনি মহাভারত থেকে যুধিষ্ঠিরের কথা গল্প করে বলেছিলেন তাদের। যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন খাঁটী মানুষ। জীবনে তিনি কোন দিন সত্য ছাড়া মিথ্যে বলেন নি। তাই একা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল সশরীরে হেঁটে স্বর্গে যাওয়া।

সেদিন আমাদের হরিদাস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল—সে এ যুগের যুধিষ্ঠির হবে!......

একদিনের ঘটনা। তখন ওরা থাকে কলকাতায়। হরিদাস পড়ে কলকাতার স্কুলে।

ছুটির দিন। রবিবার। দাদুর সঙ্গে সে বাজারে গেছে।

সারা বাজার ঘুরে অনেক কিছু কেনাকাটার পর দাদু হাজির হলেন মাছের বাজারে। ভীষণ ভীড় সেখানেও। দাদু আপন মনেই গজগজ করতে থাকেন—দেশ নাকি আমাদের গরীব, দেশের মানুষ নাকি খেতে পায় না! কিন্তু কই বাবা, আকাশ-ছোঁয়া মাছের দর—তাও হু হু কোরে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে!

দাদু ঠিকই বলেছিলেন। পচা চিংড়ি মাছও চার টাকা কিলো। দাদু সাড়ে তিন টাকা বলেছিলেন। ব্যস, মেছো তো ক্ষেপে আগুন! দাদুর মুখের ওপর সাফ জবাব দিয়ে দিল—মাছ আর কিনতে হবে না কর্তা, মাছের খানিকটা জল নিয়ে যান!......

দাদু শুনেও তার কথায় কান দেন না। হরিদাস মৃদু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। দাদু তাকে থামিয়ে দিলেন—ওদের কথায় কান দিতে নেই। জুতো না খেলে জুতো কেনা যায় না, বুঝলি?

হরিদাস দাদুর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি তবে এইটুকু বুঝেছিল—ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। মেছোরা জানে, দর শুনে এক বাবু চলে গেলেও আর একবাবু ঠিকই কিনবে। অনেক বাবুরই এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। তা ছাড়া ওরাই বা করবে কি? ফড়েদের কাছ থেকে যে দামে কিনতে হয়, তাতে এ দামে না বেচলে পড়তা পোষায় না।

মাছের বাজার ঘুরে ঘুরে দাদু প্রায় ক্লান্ত হয়ে শেষে হাজির হলেন এক মেছুনীর কাছে। দরে বনিবনা হলো—তিন টাকা করে আমেরিকান কই।

তাই নিলেন শেষ পর্যন্ত।

হরিদাস দাদুর একটা হাত ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে লক্ষ্য করলো, মেছুনী বুড়িটা ভুল করে দাদুকে দশ পয়সা বেশী ফেরত দিয়ে দিয়েছে।

দাদু কিন্তু সব ফেরত পয়সা বেমালুম ফতুয়ার পকেটে ফেলে দিলেন।

হরিদাস দেখে ফেলেছে। সুতরাং প্রতিবাদ না করলে অপরাধী মনে হবে নিজেকে।

দাদু!

কি?

ও তোমায় পয়সা বেশী দিয়েছে যে!

দাদু খিঁচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—চুপ কর্! ঠিক আছে, চ।

হরিদাসকে নিয়ে দাদু তাড়াতাড়ি মাছের বাজারের ভিড় কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

হরিদাস কিন্তু তখনও ব্যাপারটা ভোলে নি।

দাদু, ও যে তোমায়—

দাদু হরিদাসের কানটা মলে দিয়ে বললেন—চুপ কর্ ডেঁপো!

হরিদাস এবার পণ্ডিত মশাইয়ের উপদেশ তথা বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগের কথা বললো।

দাদু বুঝিয়ে দিলেন তাকে—বইয়েতে ওরকম অনেক কথাই লেখা থাকে। সত্যি কথা সব সময়ে বলা চলে না, বুঝলি?

হরিদাসদের স্কুলের কাছাকাছি আর একটা স্কুল ছিল। দুই স্কুলের ছেলেদের মধ্যে বেশ কিছুদিন

থেকে ঝগড়া চলছে। বোমা-পটকা-ইট দু পক্ষ থেকেই টিফিনের সময় বা ছুটির পর ফেলা হচ্ছে পরস্পরকে জখম করার মতলবে।

এই স্কুলের পণ্ডিত মশাই বলেন—দুই পক্ষের এই সব বন্য মহিষেরা কোনদিনই মানুষ হইবে না।

এমনি ভাগ্য যে, এ পণ্ডিতও সাধু ভাষায় কথা বলেন!

পণ্ডিত মশাইয়ের এই মন্তব্য শুনে আড়ালে এ স্কুলের বদমায়েস ছেলেরা পণ্ডিত মশাইকেই 'বন্য মহিষ' নামে অভিষিক্ত করলো!

সেদিন তখন ক্লাশ চলেছে। হরিদাসদের পাশের ঘরটি ছিল স্কুলের লাইব্রেরী ঘর। হরিদাস লক্ষ্য করলো, ক্লাশ নাইনের গুণ্ডা ছোকরা হাবু লাইব্রেরী-ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বারান্দার কোণে রাখা কাগজে-মোড়া কি একটা জিনিস নিয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

দ্যুম!

বিকট আওয়াজ। হৈ চৈ। রাস্তায় একটা ভিখারী বুড়ো আহত হয়েছে।

এর পরই দেখা গেল হাবুকে ব্যস্ত হয়ে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতে।

ব্যাপারটা বুঝতে কারও দেরী হয় নি। ছোকরা হাবুরই কাজ। কিন্তু সব জেনেও ছাত্র বা শিক্ষকরা না জানার ভান করলেন। থানার দারোগাবাবু দুজন পুলিস নিয়ে ছুটে এসেছেন হরিদাসদের স্কুলে। কিন্তু সবাই ব্যাপারটা চেপে গেলেন। এ কাজ অন্য কোন গুণ্ডার কীর্তি, স্কুলের ছেলেদের নয়!......

প্রধান শিক্ষক মশাই দারোগাবাবুকে নিয়ে ক্লাশে ক্লাশে ঘুরে দেখালেন—সব ছেলেই পড়া নিয়ে ব্যস্ত। ক্লাশ থেকে কোন ছেলেই বেরোয় নি।

কিন্তু মুশকিল বাঁধালো হরিদাস। তাদের ক্লাশে দারোগাবাবু হেড মাস্টারের সঙ্গে এলে সে-ই বলে ফেললো, হাবুকে সে ছাদ থেকে নেমে আসতে দেখেছে বোমা ফাটার একটু পরেই।

আর যায় কোথা! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা!

হাবুকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস।

আর হেড মাস্টার হরিদাসকে বেশ দু-চার ঘা বেত মেরে কান দুটো মলে দিলেন। বললেন—ব্যাটা আমার ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির!

হরিদাস সত্য কথা বলে কি অপরাধ করলো বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সবার মুখের দিকে।

পণ্ডিত মশাই কিন্তু খুশীই হয়েছিলেন। তিনি কাপড়ের খুঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছে দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন—সত্য কথা বলা এখন নিরাপদ নহে। বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকিলে সত্য কথা বলিও না!

হরিদাস বুঝলো—সত্যি কথা বুঝে-শুনে বলতে হয়। আর পণ্ডিত মশাই মাত্রই সাধু ভাষায় কথা বলেন এবং এঁদের ওপর থেকে দেখে কঠোর মনে হলেও এঁরা মানুষ ভালো হন।

হরিদাস কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরছে। তখনো কিন্তু তার দুর্গতির শেষ হয়নি। পথে ক্লাস নাইন ও টেন-এর কতকগুলো বদমায়েস ছোকরা তাকে চেপে ধরে বেশ ঘা কতক মার দিয়ে দিল। আর তেমনি বাপ-মা তুলে গালাগালি।

ওদেরই মধ্যে একটি ছেলে পোড়া সিগারেট একটা প্যান্টের পকেট থেকে বের করে ধরিয়ে দু-চার টান মেরে ওর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওকে গলাধাক্কা দিতে দিতে বললে—যা, ছেলেমানুষ বলে বেঁচে গেলি, নইলে একেবারে টেংরী খুলে নিতুম।

হরিদাস গালে কানে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে আর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর দিকে চললো। গ্রাম ছেড়ে এসেছে এখনও এক বছর হয়নি। তাই এই পরিবেশে সে যেন কেমন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। এসব ভাষার অর্থও সে বোঝে না। টেংরী মানে কী, তার জানা নেই!

বাড়িতে ফিরেও তার বোকামির জন্য বকুনি খেল সবার কাছ থেকে। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, বোকারাই শুধু এই রকম ফ্যাসাদে পড়ে আর মার খায়।

হরিদাস কিন্তু বোকাই রয়ে গেল। না পারলো স্থান কাল-পাত্র বুঝে চলতে, না পারলো মিথ্যে কথা বলতে।

স্কুলে-কলেজের পাঠ শেষ করে সে যখন রোজগারের জন্য কোর্টে বেরুল, সেখানেও সেই একই অবস্থা! বাবা-মার ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে ওকালতি পাশ করতে হয়েছিল। কিন্তু উকীল না হলেই বুঝি ভালো হতো তার পক্ষে।

হরিদাসের দারুণ আফসোস—এখানেও সেই মিথ্যে কথা! আসামীকে বাঁচানোর জন্য আইনের ফাঁক খুঁজতে হয়, অনেক সময় মিথ্যের আশ্রয়ও নিতে হয়।

উকীল মহলে সবাই তাকে যুধিষ্ঠির উকীল বলে। এর ফলে আদালতে তার পশার জমে না। শেষ পর্যন্ত সে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে স্কুলমাস্টারির চাকরী নিলে। এ চাকরী অনেক ভালো। এখানে কাজে ফাঁকি থাকলেও মিথ্যে কথা বলার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না!......

হরিদাসের স্বভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। সত্য ছাড়া সে মিথ্যা বলে না। তার শিক্ষক-বন্ধুরা তাকে কলিযুগের যুধিষ্ঠির বলে! সে তাদের কথার প্রতিবাদ করে না।

সেদিন হরিদাস তার এক শিক্ষক-বন্ধুর সংগে বাসে ফিরছে কালীঘাট থেকে। কলেজ স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে সে এক বিপদ বাঁধালো।

মাসের প্রথম সপ্তাহ। এই সময়ে পকেটমারদের ভীড় থাকে ট্রামে-বাসে। হরিদাস লক্ষ্য করলো—এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে বেমালুম একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে তাঁর পাশের প্যান্ট-শার্ট-পরা ছোকরাটি নিজের পকেটে পুরে ফেললো।

পকেটমার! পকেটমার! পাকড়ো—পাকড়ো—

হরিদাস হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু আশ্চর্য, সেই প্যান্ট-পরা পকেটমার ছোকরাটাই বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠলো সবার আগে—কোথায় বলুন তো মশাই! এদের জ্বালায় ট্রামে-বাসে চলা বিপদ হয়ে উঠলো।

হরিদাস এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামার কলারটি চেপে ধরে বললো—ন্যাকামি করার জায়গা পাও না, পকেটমার কোথাকার!

বাসসুদ্ধ লোক তো অবাক। যাঁর ব্যাগ তিনি তো তখন প্রায় কাঁদতে শুরু করেছেন ঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে মশাই, আমার এক মাসের সংসার-খরচা—

সবাই ততক্ষণে চেপে ধরেছে ছোকরাটিকে।

ছোকরাটি কিন্তু রেগেই আগুন। ইংরাজী-বাংলায় মিশিয়ে যা বললো, তার মর্মার্থ হলো—কে পকেট মার আগে তাই দেখুন!

এযুগের শিক্ষিত পকেটমার!

তারপর সে এক ভেজবাজী। হরিদাসের পকেট থেকেই সে ছোকরা ব্যাগটা বের করে দেখালো সবাইকে। ভীড়ের মধ্যে এক ফাঁকে ব্যাগটা তার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সে।

আবার সবাই অবাক। লোকটিকে তো পকেটমার বলে মনে হয় না!

হরিদাসের তখন মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। ফ্যালফ্যাল করে সে সবার দিকে তাকালো। নিজের শিক্ষক-বন্ধুটিকে খুঁজলো। কিন্তু ভীড় কাটিয়ে ওকে কিছু না জানিয়েই তিনি কোন্ ফাঁকে নেমে গেছেন বাস থেকে।

বিচারে হরিদাসের ছ' মাসের জেল হয়ে গেল। বিচারক কোন আপত্তিই শুনলেন না। ব্যাগ যখন ওর জামার পকেট থেকে বেরিয়েছে, তখন সে পকেটমার না হয়েই যায় না! অতি চতুর ব্যক্তিরা অনেক সময় নিরেট বোকার ভান করে। এরা সব ভিজে বেড়ালের দল!...

হরিদাস জীবন-যন্ত্রণায় ভুগছে। দিনের আহার রাতের ঘুম তার চলে গেছে। জেলের ঐ পরিবেশের মধ্যে সে দারুণ অসহায়। সারা গায়ে দারুণ ব্যথা-যন্ত্রণা। কিল, ঘুষি, চাপড় অনেক সহ্য করতে তাকে হয়েছে। বিশেষ করে সেই পকেটমার ছোকরাটি তাকে মেরেছে সব থেকে বেশী। কারণ, তারই পুরোপুরি লোকসান হলো। মাসের গোড়ার দিকে আমদানি ভালোই হয়েছিল। কিন্তু তা আজ পেয়েও হারাতে হলো এই বোকা লোকটার জন্যে। ব্যাটা, কলিযুগের যুধিষ্ঠির! দুনিয়ায় সব লোকের ভালো করতে চায়! এখন তার ফল বুঝুক। জেলের ঘানি টেনে আসুক কয়েক মাসের জন্য।

হরিদাস জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবছে আজ। তার ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের বন্ধুরা তার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করতো, তা মিথ্যে নয়। আজকের যুগে তার মতো মানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। এই ভেজালের যুগে তার মতো খাঁটি মানুষ নিতান্ত বেকুব ছাড়া কিছু নয়।

হরিদাস আজ যেন নিজের ভুল বুঝতে পারছে। তার ধারণা হয়—বিদ্যাসাগর মশাই বেঁচে থাকলে তিনিও আজ তার মতো বেকুব প্রমাণিত হতেন। 'সদা সত্য কথা বলিবে'—এ কথা তিনি সে যুগের মানুষদের জন্যে লিখেছিলেন, এ যুগের মানুষদের জন্যে নয়।

হরিদাসের এ যুগে জন্মানো উচিত হয়নি!......

এ পৃথিবী বুঝি আজও তার সমস্ত কিছু রহস্য মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেনি। যুগে যুগে প্রকৃতির গহন অভ্যন্তর থেকে এক একটি বস্তু প্রকাশিত হয়ে সমস্ত মানব সমাজকে চমকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

বছর কয়েক আগে যে মালয়ের জঙ্গলে লোমশ-মানুষ (না, বাঁদর?) দেখা গেছে তারা কারা? তারা জন্তু—না মানুষ? মানুষ হলে কোন্ ধরনের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ? তারা কি তাহলে সেই আদিম পিথেক্যান্থ্রোপাস্-জাতীয় প্রথম মানব ও আজকের যুগের সুসভ্য মানুষের মধ্যেকার কোন প্রাচীন যোগসূত্র? এরা তাহলে এতদিন সভ্যতা ও বিবর্তনের স্রোত এড়িয়ে বেঁচে ছিল কি করে? এরা যেন মনে হয় নেগ্রিটোজ্-দের থেকেও সুপ্রাচীন!

বীরু চট্টোপাধ্যায়

বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের গভীর গহন অরণ্যে বা পর্বতের দুর্গমতায় আচমকা এরা মুখোমুখি হচ্ছে সুসভ্য মানুষের, তারপর চোখের পলকে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

ধরা যাক সেই চীনে কিশোরীটির কথা। রবার বাগানের কর্মী মেয়েটি একদিন জঙ্গলের মধ্যে এক নদীর ধারে ট্যাপ করতে (গাছ কেটে রস বের করতে) গিয়েছিল। সে যখন ট্যাপ করতে ব্যস্ত, সহসা সে অনুভব করলো পেছন থেকে কে যেন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। সাংঘাতিক চমকে সে মাথা নিচু করে দেখতে গিয়ে সভয়ে দেখলো জড়িয়ে ধরা হাত দু'খানি সম্পূর্ণ লোমে ঢাকা। পেছন দিকে চেয়ে দেখলো কালো লোমে ঢাকা বীভৎস একটি নারী-জাতীয় মুখ। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে দুটো দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। আর তার গায়ে জন্তু-সুলভ দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

অকল্পনীয় আতঙ্কে ষোল বছরের চীনে মেয়েটি আর্ত চীৎকার করে উঠলো। সহসা তার নজরে পড়লো পেছন দিকে গভীর জঙ্গলের কিনারায় সারা-অঙ্গ-লোমে-ঢাকা ঠোঁটের-দুপাশে-দুই-দাঁত-বের-হওয়া দুজন দৈত্যের মত প্রাণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা ওর ভয় পাওয়া দেখে বুঝি খুবই আনন্দে পাচ্ছে, এমন ভাবে দাঁত বার করে হি হি করে হাসছিল।

তারপর আর কিছু মনে নেই মেয়েটির, প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে অমানুষিক প্রচেষ্টায় সেই লোমশ দানবীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোন মতে সে পালিয়ে এসেছে।

পরে প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলেছে লোমশ পুরুষগুলো কম্ সে কম ছ' ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট হবে। লোকগুলো নাকি হয় চামড়া কিংবা গাছের ছালের নেংটি পরে ছিল। লোকগুলোর গোঁফের দুই প্রান্ত লম্বা হতে হতে পেটের লোমের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ওদের দুজনের কোমরে ছুরিজাতীয় কি এক অস্ত্র ঝুলছিল। নারীর পরনে ছিল হলদে রঙের গাছের ছাল। চীনে মেয়েটির মনে হয়েছে যে ঐ লোমের নিচে ওদের গায়ের চামড়ার রং সাদা ছিল।

যে লোমশ নারী জড়িয়ে ধরেছিল, সে কি কিছু কথা বলেছে? হ্যাঁ। তবে চীনে মেয়েটি সে কিচির মিচির ভাষার এক বর্ণও বোঝে নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যে এদের দর্শন পেল সে হলো আবদুল তালিব নামে একজন মালয়ী পুলিশ কর্পোরাল।

তারা কয়েকজন মিলে যখন পেট্রল দিচ্ছিল, সহসা ট্রোলক নদীর ওপারে তিনটি মানুষের মত লোমশ প্রাণীকে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে বলতে যেতে দেখলো। কর্পোরাল তার রাইফেল ওদের দিকে তাক করতেই তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি যে এদের দর্শন পেল সে একজন ভারতীয় মানুষ। মাদ্রাজী রবার-কর্মী। সে যখন গাছ ট্যাপ করছিল, অকস্মাৎ তাকে দুখানি লোমশ হাত এসে বুকে পিঠে জড়িয়ে ধরে। বহু ধস্তাধস্তির পর সেই মাদ্রাজী কর্মী ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে ঢালু পথ দিয়ে গড়িয়ে বহু নিচে পড়ে যায়। সেই পড়বার মুখে সে উক্ত লোমশ দানবের হা হা হা অট্টহাসি শুনতে পায়। তার পরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

চীনে মেয়ে, কর্পোরাল এবং মাদ্রাজী শ্রমিক, এদের তিন জনের বর্ণনাই হুবহু এক। সারা দেহ এদের গভীর লোমে ঢাকা। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে লম্বা দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে। এরা কিচির মিচির করে যে ভাষায় কথা বলেছে, তা এরা কেউ বুঝতে পারেনি। চীনে মেয়েটির ভাষা ক্যান্টনিজ, কর্পোরালের ভাষা মালয়ী আর মাদ্রাজীর ভাষা তামিল। তিন জনেই জানালো, এদের গায়ে জান্তব বিদঘুটে গন্ধ বিদ্যমান।

এরা তাহলে কারা? এরা কি বাঁদর থেকে বিবর্তনের মুখে থেমে-থাকা আদিম বন্য মানুষ? না কি মানব সমাজের কাছে আজও অজ্ঞাত কোন জন্তুবিশেষ। এরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এতকাল বেঁচে রইলো কি ভাবে? এরা কি খায়, কি পরে, কি ভাবে জীবনযাপন করে, এদের ভাষাই বা কি, এসব প্রশ্ন সে সময় মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

এর ভেতরে এক মজার ব্যাপার হলো। স্টুয়ার্ট ওয়াভেল নামে এক শ্বেতাঙ্গ মানুষ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে লাগলো ঐ লোমশ মানুষ দেখবার উদ্দেশ্যে। এমনিতে ওখানকার অধিবাসীরা 'লোমশ পুরুষ' এবং 'লোমশ নারী'র কথা শুনে শঙ্কিত ছিল, তার উপরে ঝোপেঝাপে লুকিয়ে থাকা সাহেবকে কজন দেখে ফেললো এবং গুজব রটে গেল, মালয়ের জঙ্গলে একজন 'সাহেব বনমানুষ'ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আতঙ্ক কমাতে লোকদের কম বেগ পেতে হয় নি।

হেনরি কার্ডলিং নামে এক প্রৌঢ় সাহেব জানালেন, বছর কুড়ি আগে তিনি এই ধরনের লোমশ মানব দেখেছেন। তিনি ও একজন সামরিক অফিসার একদা দেখলেন মুয়ার বাটু আনাম রোডের উপর দিয়ে লোমশ এক মানব-দম্পতি হেঁটে চলেছে। নারীর পরনে লাল একটা ন্যাকড়া। নরের কাঁধে একটা দশ ফিট দীর্ঘ ডাল। ওঁরা গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। সহসা ড্রাইভার চীৎকার করে উঠলো, ওরাং উটান! ওঁরা চোখ তুলে তাকাতেই দেখলেন ঐ লোমশ নর ও নারীটিকে। গাড়ী কাছে আসতে দেখা গেল লোমশ মানবেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাশের জঙ্গলে নেমে ছুটে পালিয়ে গেল।

পিথেক্যানথ্রোপস্ নামক আদিম মানুষের শিল্পীকৃত মডেল

এরা কি তবে বর্তমানে দেখা তিনজন লোমশ মানবের পিতৃপুরুষ।

মিঃ বয়সিয়র নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার এর চেয়েও বিস্ময়কর সংবাদ দেন। তিনি বললেন, ঐ ধরনের প্রায় দেড়শ' জনের একটি লোমশ মানবের কলোনী আছে যেখানে মিঃ কাউলিং লোমশ দম্পতিকে দেখেছিলেন। ওরা নাকি গাছে গাছে বাস করে।

মালয়ের প্রখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ওং পুলিম এক কাহিনী বলেন। বিশ বছর আগে এই ধরনের একটি প্রাণীকে নাকি ধরা হয়েছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্নিওতে—সারাওয়াক সীমান্তের কাছে গভীর জঙ্গলে।

একদল জেলে দেখে যে একটা লোমশ প্রাণী গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে চলেছে। গ্রামবাসীদের ডেকে সবাই মিলে বহু চেষ্টায় ওরা সেই প্রাণীটাকে পাকড়াও করে। ধৃত হয়ে সেই লোমশ মানুষটি ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও তাকে কিছু খাওয়ান যায় না। অবশেষে সে প্রাণ ত্যাগ করে।

কুয়ালালামপুরে এক দল গ্রাম্য মানুষ একদা নদীর ঘাটে এই ধরনের লোমশ মানুষকে স্নান করতে দেখেছিল।

আরেক জন শ্বেতাঙ্গ জানালেন যে ১৯২৭-এ তিনি এই রকম একটি লোমশ মানুষ দেখেছিলেন মালয়ের জঙ্গলে। দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করছে দেখে হিংস্র জন্তু ভেবে তিনি গুলি করেন। সহসা মানুষের কণ্ঠে নিদারুণ আর্ত চীৎকার করে উঠে দাঁড়ায় লোমশ মানুষ। গুলিবিদ্ধ বাম হাতটি ডান হাতে চেপে ধরে সে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বর্মা দেশের জঙ্গলেও একাধিকবার এই ধরনের আজব প্রাণী দেখা গেছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ, কো পো চেট নামে একজন বার্মিজ আর নিড় বাহাদুর নামে জনৈক গুর্খা, এই তিনজন একদিন সারা রাত্রি ভয়-পাওয়া কুকুরের ডাক শুনে অনুসন্ধানে বের হয় পাশের পার্বত্য জঙ্গলে।

সহসা শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের নজরে পড়ে অদূরে এক লোমশ দানব চলেছে এবং পেছনে তার আরও চার জন অনুসরণ করছে। দেখেই সাহেবের হাঁটু ভয়ে দুর্বল হয়ে কাঁপতে শুরু করে। তিনি পেছন ফিরে বন্দুকটা চান। বন্দুকটা ছিল বার্মিজ কো পো চেট-এর হাতে। দেখা গেল বন্দুক মাটিতে ফেলে সে পেছন দিকে চোঁচা দৌড়ে যেতে যেতে বলছে, সাহেব বন্দুক-ছোঁবেন না, গুলি করলে ভীষণ বিপদ হবে।

ঐ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখা গেল সেই লোমশ মানবের দল দ্রুত হেঁটে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বার্মিজ লোকটি অবশ্য ভিন্ন কথা বললে, এরা জীবিত প্রাণী নয়। এদের নাকি বার্মায় প্রায়ই দেখা যায়। এরা হল নিহত মানুষের প্রেতাত্মা, কখনো দৃশ্য হয় কখনো অদৃশ্য। এরা এদের খুনীদের খুঁজে বেড়ায়, বাগে পেলে সেই খুনীদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

ডি. মরগ্যান নামে একজন লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে মালয়ের দুর্গম পর্বতের শীর্ষে গুহার মধ্যে এক ধরনের গভীর রঙের ক্ষুদ্রকায় বাঁদর বাস করে, যাদের গায়ে কোঁকড়ানো লাল রঙের লোম রয়েছে। তারা নাকি আগুন জ্বালাতে পারে, আগুনের ব্যবহার জানে এবং এমন এক ভাষায় কথা বলে যা মালয়ী-দের কাছে অজ্ঞাত। ওরা নাকি পাথরের অস্ত্রও তৈরি করতে জানে। ওদের পরিত্যক্ত গুহায় ছাই এবং প্রস্তর-ঘসা কুঠার পাওয়া গেছে।

শুধু তাই নয়, এ ধরনের প্রায় অবিশ্বাস্য অনেক আজব প্রাণীর কথাই শোনা যায়। পি. টং. লুয়াং নামক নাকি এক ধরনের বাঁদর আছে, যাদের হাত পা অবিকল মানুষের মত। তারা নাকি ইন্দোচীন-সীমান্তে শ্যাম দেশের জঙ্গলে বাস করে। কথিত আছে, এদের একটিকে ধরে একদা রাজা চুলালঙকর্ণ-এর দরবারে বালক-ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ডি. মরগ্যান কথিত বানর জাতীয় প্রাণী—যারা আগুনের ব্যবহার জানে এবং প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

আরেকটি অবিশ্বাস্য কাহিনী প্রচলিত আছে মালয় প্রদেশে। বেবিলাউট নামক হাঁসের মত পা-ওয়ালা হাজার হাজার শূকর নাকি একদা বোর্নিও থেকে সমুদ্র সাঁতরে এসে জোহর উপকূল দিয়ে মালয়ে প্রবেশ করে-ছিল। তারা কোথায়? তাদের কি বাঘে খেয়ে ফেলেছে?

প্রকৃতি আরও কত রহস্য উদ্ঘাটন করবে যুগে যুগে। তুষার মানব এক নিদারুণ রহস্য। আমাজনের জঙ্গলে যে সব আজব আদিম মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা কারা? তারা কি প্রকৃতই মানুষ? নাকি দানব-বানর? কে জানে?

দুই সম্পাদক

টুটুল দাশগুপ্ত

লাইটপোস্টের মিট্‌মিটে আলোতে ভদ্রলোককে ছাতা বগলে ধুতির কোঁচা ধরে চটি ছপ্‌ছপিয়ে 'কচি ও কাঁচা'র অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে বুকের মধ্যে সেতারের তার ছেঁড়ার মত ঝঙ্‌ করে শব্দ হল। আর কেউ বিশ্বাস না করুক, উনি যে আমার উপাস্য দেবতাস্বরূপ, এ কথা আমার অন্তর্যামী এক কথায় মানবেন। আর দেবতাকে এমনি বাদলার দিনে একাকী অসহায় অবস্থায় পাওয়ার মত সুবর্ণসুযোগ একবার বই দুবার আসে না। অতএব ছুটে গিয়ে ভদ্রলোককে ধরলাম। কপাল ভাল বলতে হবে, ঠিক তখনই ঝম্‌ঝম্‌ করে সকাল থেকে পচিয়ে মারা ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টিটা আবার নতুন উদ্যমে বর্ষণ শুরু করলো।

ভদ্রলোক ছাতা খুলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে বললাম, ওটা আর খুলবেন না। এই নিন আমার ওয়াটারপ্রুফ্‌টা। পুঁচকে ছাতায় কি আর কাজ হয়?

বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে পীড়াপীড়ি করে ওঁর গায়ে চড়িয়ে দিলাম। কৃতার্থের হাসি হেসে বললাম, ব্যস্ত হবেন না, জল গায়ে মাখার অভ্যাস আমার আছে।

এতটা ভদ্রতার কারণ?— ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ হন।

—বারে, আপনার একটু উপকার করতে আবার কারণ অকারণ ভাবতে হয় নাকি? আপনি জানেন না, 'কচি ও কাঁচা' আমার হৃদয়ের কতটা অংশ জুড়ে আছে।

ওহো, বই পড়ার বাতিক আছে বুঝি তোমার? —ভদ্রলোককে প্রফুল্ল মনে হল।

মাথাটা একটু হেঁট করে বললাম, শুধু পড়া নয়, লিখতেও পারি কিছু কিছু। কিন্তু......

কিন্তু কি? —ভদ্রলোক পুলকিত হয়ে বল্‌লেন, লিখতে পারা তো গুণের কথা। তবে এখনই বাপু ছাপার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। অনেকে লিখতে শুরু করেই লেখক হতে চায়—দেখ্‌ছি তো।

সায় দিয়ে বললাম, তা তো দেখবেনই, রোজ কত শত লেখা আপনার দপ্তরে এসে জমা হচ্ছে। সম্পাদকের ঘাড়েই তো বাছবিচারের দায়িত্ব। তাই বলছিলাম কি— এবার থেকে যদি আপনার পরামর্শ মত আপনার বলে দেওয়া ঢঙে লিখি তবে বোধহয়......

বাকীটা শেষ করি না—শেষ করতে হয় না বলেই।

ভদ্রলোক তখন কিন্তু এক পকেট থেকে আরেক পকেটে কি হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছেন। আমি কৌতূহল প্রকাশ করতে স্বগতোক্তি করলেন, পানের কৌটোটা যে কোথায় ফেল্‌লাম!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আপনি হাঁটতে থাকুন, আমি দোকান থেকে এক্ষুণি একটা পান কিনে আনছি।

ভদ্রলোক নির্লিপ্তভাবে বললেন, সেই সঙ্গে পয়সায় কুলোলে একটা ক্যাপস্টানও এনো। পানের পর সিগারেট না টানলে আমার আবার বদ্‌হজম হয়। ভারী বিচ্ছিরি অভ্যাস করে ফেলেছি।

ওঁর মন্তব্যটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, না না, বিচ্ছিরি অভ্যাস কে বললে? আমি এখুনি আনছি। আপনার কাছে দেশলাই আছে তো? না থাকলে একটা নতুন কিনে নিয়ে আসতে পারি। কি, আছে?

ভদ্রলোক আবার এ পকেট ও পকেট হাত্ড়ে নিঃসংশয় হয়ে বললেন, ভাল কথাই মনে করেছো। দেশলাইটাও বোধহয় অফিসে ফেলে এসেছি।

আমি সমব্যথীর মত বললাম, হাজার কাজের ভীড়ে এ সব খুঁটিনাটির দিকে কি মন থাকে! যাক্‌গে, আমি এই এলাম বলে।

পান, সিগারেট আর দেশলাই কিনে এনে দিলাম। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে তেমাথার মোড়ে এসে ভদ্রলোককে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলাম। উনি আপত্তি করলেও ড্রাইভারের হাতে পাঁচ টাকা আগাম গুঁজে দিয়ে বললাম, ভাড়া কেটে রেখে বাকী পয়সা বাবুকে ফেরত দিও।

ট্যাক্সি স্টার্ট নিতে গাড়ীর জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে বিনীতভাবে বললাম, কাল তবে একটা আনকোরা নতুন গল্প নিয়ে আপনার কাছে যাব। কোথাও যদি পরিবর্তন করার থাকে আপনার মুখে থেকেই শুনে নেব।

ভদ্রলোক মুখে কিছু না বললেও ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলেন। যাক্ দেবতা প্রসন্ন হলেন। একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে আমাকে ফেলে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

পরদিন বারোটার আগেই ধোপদুরস্ত হয়ে ফুল-স্ক্যাপ কাগজে নতুন লেখা গল্পটার পাণ্ডুলিপিসহ 'কাঁচ ও কাঁচা'র অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দরজা ঠেলে সম্পাদকের ঘরে ঢুকতেই একটু ঘাবড়ে গেলাম—বলতে কি! কালকের পরিচিত মানুষটিকে আর মালুম হবার যো নেই, কোটপ্যান্টপরা রাশভারী গোছের একটি দশাসই মূর্তি। ঠোঁটের ফাঁকে আলগোছে চেপে ধরা পাইপ থেকে মৃদু ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ভেবে অবাক হলাম—কাজের বাইরে আর কাজের মধ্যে মানুষের হাবভাবের কি বিপুল তারতম্য হতে পারে। যাক্ গে, সম্পাদকরা ও রকম ভোল পাল্টে থাকেন, নইলে আর তাঁরা সম্পাদক কিসের!

একটা নমস্কার ঠুকে চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে গল্পের কাগজগুলি খুলতে খুলতে বললাম, কালকে বলে-ছিলাম নতুন গল্প আনবো, এনেছি।

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভাববার চেষ্টা করলেন। তারপর রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাও না, তোমাকে গল্প আনতে বলেছিলুম আমি?

আমি হতভম্বের মত তাকিয়ে থেকে বললাম, কালকে ট্যাক্সিতে ওঠার সময় আপনাকে বললুম না?

পাগলের পাল্লায় পড়লুম না তো!—সম্পাদকের মুখে আশঙ্কার ছাপ পড়লো। পরক্ষণেই তার মুখের ভাব বদলে লাল আভা দেখা গেল। বুঝলাম উনি রেগে আগুন হয়ে উঠছেন।

ভয়ের চোটে বারবার ঢোঁক গিলছিলাম বোধ হয়, উনি তাই দেখে গলাটা একটু নরম করে বললেন, নেশা-টেশা করো নাকি? গল্পের বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে? চুনোপুঁটিদের সঙ্গে কারবার করতে বসলে আমার কাগজে অনেক আগেই লালবাতি জ্বলে যেত।

আমি বিমূঢ়ের মত বললাম, তবে ঐ লোকটা কে?

কোন্ লোকটা?—সম্পাদক হঠাৎ থই পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে কথা হয়েছিল তোমার? নিশ্চয়ই কোন চিটিংবাজ হবে। কেমন দেখতে?

বললাম, মোটা বেঁটে পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, হাতে ছাতা, কাল সন্ধ্যের সময় এখান থেকে বেরুচ্ছিলেন।

সম্পাদক হো হো করে হেসে উঠে বললেন, চিনেছি চিনেছি, ও মক্কেলকে আমার ভালমত চেনা আছে। কাল আমার কাছে এসে হতভাগার সে কি ঝুলোঝুলি! একটা গল্প ওর ছাপতেই হবে। বউ নাকি গঞ্জনা দেয় কোন কাগজে লেখা বেরোয় না বলে। অনেক করে বোঝালাম, তা লোকটা কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে বেয়ারা ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে তবে যায়।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। সম্পাদক ভেবে যাকে এত খাতির করে প্রায় সর্ব-স্বান্ত হলাম, সে তবে আমারই মত গল্পের উমেদার! হায় ভগবান, এভাবে তোমার সন্তানকে বঞ্চনা করলে!

সম্পাদক মশাই আবার বললেন, হতভাগা ওর পানের কৌটোটা ফেলে গেছে। এটা নিতে ফের না ঘুরে আসে! এলে নির্ঘাৎ লাঠি পেটা করবো।

আমি শুধু ভাবছিলাম, কাল কি কি খরচ করেছি। পান, সিগারেট, দেশলাই, ট্যাক্সির পাঁচ টাকা আর......

অ্যাঁ! এই মুহূর্তে মনে পড়লো, ওয়াটারপ্রুফটা তো চেয়ে নিতে ভুলে গেছি। উনি ওটা গায়ে দিয়েই দিব্যি ট্যাক্সিতে চেপে বেরিয়ে গেলেন! তাঁর একবারও মনে হয় নি, ওটা পরের জিনিস। মাইকেলের কথা মনে পড়লো—আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!

তুমি এবার আসতে পার। আমার অনেক দরকারী কাজ পড়ে আছে।—সম্পাদক মশাই ঠিক সম্পাদকী মেজাজেই কথাটা বললেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম সম্পাদকমশাই গজরাচ্ছেন—নাঃ দিন্‌কে দিন এই সব উট্‌কো আপদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সুস্থ হয়ে কাজ করার যো নেই!...

গুপীদাদুর গল্প

সুতপা চক্রবর্তী

ভর দুপুরে খেয়ে দেয়ে সকলে একটু বিশ্রাম নিতেই সারা পাড়া যখন ঝিম মেরে যায়, প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে লাল সুড়কির রাস্তা দিয়ে খড়মের খটখট আওয়াজ তুলে চলতে থাকে গুপী বুড়ো। আর অমনি এ বাড়ী সে বাড়ীর জানলা দিয়ে দুষ্টু ছেলেরা গলা বাড়িয়ে চেঁচাতে থাকে, 'ও গুপী দাদু, গুপী দাদু! দুপুর বেলায় চললে কোথায়?'

প্রতিদিনের মত মুখ না তুলেই দাদু উত্তর দেয়, 'রাজবাড়ি'।

ছেলেরা আবার বলে, 'রাজবাড়ি যাচ্ছ কি করতে?'

গুপী বলে, 'নেমন্তন্ন খেতে।'

'ফিরবার সময় কী খেয়ে গেলে বলে যেও কিন্তু!'

ফোকলা মুখে একরাশ হাসি টেনে চলতে চলতেই গুপী জবাব দেয়, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব। রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন, কী খেয়ে এলুম—না বলে গেলে এত খাওয়া যে হজম করতে পারব না রে।'

খটর খটর আওয়াজ ক্রমেই মিলিয়ে যায়। ছেলেরা কিন্তু নেমন্তন্নর কথা ভুলে যায় না। আবার ঘণ্টা খানেক পরই কেউ না কেউ গুপী দাদুকে ঐ পথে ফিরতে দেখেই, ধরে বসে, 'কী দাদু, রাজবাড়িতে কেমন খাওয়া হলো?'

দাদু সোৎসাহে বলে ওঠেন, 'ওরে ব্বাবা, থাম্ থাম্, একটু মনে করতে দে—' তারপরই দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'সে কি খাওয়া? সে যে ভোজ! রাজবাড়ির নেমন্তন্ন, সে কি যে সে ব্যাপার রে? খেয়ে এলুম ইলিশ মাছের চচ্চড়ি, রুইকাতলার গড়গড়ি, লুচি, মণ্ডা, মিঠাই, পায়েস, কত কি! এমন ভরপেট খেলুম এখন আর নড়তে পারছি নে।'

প্রতিদিনই এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। ছেলেদের যেমন এক প্রশ্ন, দাদুর মুখেও তেমনি নেমন্তন্ন খাওয়ার একই গল্প। ছেলেরা মজা পেত। হয়ত বা কিছুটা বিশ্বাসও করত। পাড়ার মধ্যে তোরণ-অলা মস্ত ঐ বাড়িতে রোজ রোজ দাদুর ভোজের নেমন্তন্নে বুঝি বা একটু হিংসেও হতো।

গুপী দাদুকে নিয়ে এমনি আরও মজা ছিল ছোটদের। দাদু ছিলেন পাড়ার এক বিচিত্র মানুষ। তিনি একাই থাকতেন। পাড়ার সবচেয়ে বড় মাঠটার এক কোণে পথের ধারে তাঁর একখানা ঘর। মাটির ঘর, দরমার বেড়া। ওপরে টিন আর খড়ের ছাউনি। রাস্তার দিকে ছোট্ট একটি জানলা। দাদু সারাদিন ঐ ঘরে বসে

কি করতেন, কি করে সময় কাটাতেন জানি না, তবে বিকেলে ছেলের দল যখন মাঠে খেলা করত, তিনি আর কিছুতেই ঘরে থাকতে পারতেন না। লাঠিগাছটি হাতে নিয়ে মাঠে এসে বসতেন। ছানি পড়া চোখে পুরু কাঁচের চশমা দিয়ে বিশেষ কিছু দেখতে না পেলেও হাসি হাসি মুখ নিয়ে বসে থাকতেন অনেকক্ষণ। ছেলেরা খেলার শেষে তাঁকে ঘিরে বসত, বায়না ধরত, 'একটা গল্প বলো না, দাদু!'

দাদু মহাখুশী হয়ে তাদের বায়না মেটাতেন। কোন কোন দিন বলতেন, 'তবে শোন্। এ গল্প বানানো নয় রে—একেবারে সত্যি। অনেক দিন আগের কথা। তোরা তখন জন্মাস নি। এই মাঠে তখনও খেলা হতো। সেদিন খেলত তোদের বাবারা আর আমি বসে খেলা দেখতুম। খেলার শেষে আমাকে ঘিরে ধরে ওরাও ঠিক তোদের মতই বায়না জুড়ত, 'দাদু একটা গল্প বলো'—

ছেলেরা বলত, 'তখন তুমি কত বড়, দাদু?'

দাদু ফিক্ করে হেসে ফেলে বলতেন, 'তখনও আমি চুল পাকা বুড়ো। আর এখন, দেখছিস তো সম্পূর্ণ পাকা ফল! টুস্‌টুসে হয়ে আছি! একটু টোকা খেলেই টুক্ করে খসে পড়ব।'

তারপরেও চলত দাদুর কত মজার গল্প—মজার মজার ঘটনা। ছেলেরা সে গল্প গপাগপ্ গিলত।

গল্পে গল্পে সন্ধ্যে কখন গড়িয়ে যেত। ছেলেরা তারপর যে-যার বাড়ি চলে যেত। দাদুকে সেই সময় বড় ক্লান্ত, বড় নিঃসঙ্গ আর বিমর্ষ দেখাত। শেষে সেই ক্লান্ত পায়েই উঠে দাঁড়াতেন সোনা বাঁধানো লাঠিগাছটি নিয়ে। ঠুক্‌ঠুক করে নিজের খোড়ো ঘরটিতে ঢুকতেন।

টিম্‌টিম্ করে আলো জ্বলত ঘরে। কোণের দিকে ছোট্ট মাটির পিদিম জ্বলত। জানলা দিয়ে একদিন উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম, সেখানে একটা মনসার থান। সামনে পাথরের থালায় দুধ, কলা। আরও দেখেছিলাম, হোগলার বেড়ার গায়ে দুটি ঝোলানো ফটোগ্রাফ। একটি ছবি সধবা এক মহিলার—কপালে বড় টিপ্, মাথায় শাড়ীর আঁচল। আর একটি দাদুর কিশোর পুত্রের।

দাদুর মুখে শুনেছিলাম তাদের কথা। দেশের বাড়িতে সাপের কামড়ে দুজনেই মারা যায়। দাদু তখন রাজবাড়ির খাজাঞ্চীখানায় সবে ঢুকেছেন। ছুটি নিয়ে দেশে পৌঁছে স্ত্রী-পুত্রের আর জ্যান্ত মুখ দেখতে পান নি। তবে এক আত্মীয়ার মুখে শুনেছিলেন, মরার আগে স্ত্রী নাকি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'ওগো মা মনসার পুজো করো, তিনি যেন তোমায় রাখেন।'

এ গল্প করে দাদু বলেছিলেন, 'এর পরেও মা মনসার পুজো! যার বউ গেল, ছেলে গেল মনসার কোপে, তাকে কিনা মনসারই তোষণ করতে বলে গেল বউ। আশ্চর্য তো মেয়েমানুষের ভক্তি!'

তবু কথাটা রেখেছিলেন তিনি। কাজের জায়গায় ফিরে এসে কুঁড়ের ভেতরেই থান বসালেন মনসার। আশা ছিল, একদিন বউ আসবে ছেলে আসবে এ ঘরে। তা তো হলো না, এলেন মনসা দেবী। কিন্তু সেই মনসা দেবীই যে একদিন সবটুকু গ্রাস করে বসবেন, তা কে জানত?

গুপী দাদু বাস করতে লাগলেন তাঁর কুঁড়েতে—খাওয়া দাওয়া চলতে লাগল রাজবাড়িতেই। মহারাজ বিষ্ণুপ্রসন্ন চৌধুরী এই অতি বিশ্বস্ত লোকটিকে প্রথম দিন থেকেই সহানুভূতির চোখে দেখে এসেছেন। তাই মাস গেলে কুড়িটি টাকা মাসোহারা তাঁর হাতে তুলে দিতেন। আর নিঃখরচায় খাবারের দায়ও বহন করতেন।

তিনি মারা যাবার পরও নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। গুপী দাদুর অন্তরঙ্গ ছিলেন শিবপ্রসন্ন। তিনি তাঁর মাসোহারা আর একটু বাড়াতে চাইলে গুপী দাদু তাঁর হাত চেপে চোখের জল মুছে বললেন, 'ভাই, ব্রাহ্মণের তো দক্ষিণাগ্রহণে কোনদিন আপত্তি নেই, তবে—আর কেন? মাসোহারা বাড়ানোর কি প্রয়োজন? বেঁচে আছি, দুটো খেতে পাচ্ছি, সে তো তোমাদেরই দয়ায়। বুড়ো বয়সে তোমরাই দেখবে, এটুকু ভরসা রাখি!'

কিন্তু শিবপ্রসন্নর প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না। তাই মাত্র ৫২ বছর বয়সে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়। তারপর থেকেই রাজবাড়ির ঐশ্বর্য বারো ভূতের হাতে গিয়ে পড়ে। নাবালক মণিপ্রসন্ন বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে যেদিন সাবালকত্ব অর্জন করলো সেদিন এস্টেটের অবস্থা অতি শোচনীয়। উৎসবের বাতি নিবু নিবু প্রায়। পুরনো আমলের লোকজন অনেক ছাঁটাই হলো—গুপী দাদু অবশ্য টিঁকে রইলেন।

কিন্তু হঠাৎ দেশ বিভাগে আর এক বিপর্যয় ঘটল। জমিদারী ব্যবস্থা লোপ হয়ে গেল। যাঁদের সম্পত্তি বেশী তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে-যার সম্পত্তি বেচে দিলেন। মণিপ্রসন্নও বেচে দিলেন অনেকটা অংশ। ছোট্ট একটি অংশে নিজেরা বাস করতে লাগলেন। কিন্তু আয় নেই, অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়ালো যে সবার আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হলো। গুপী দাদু তখনও এঁদের পরিবারেরই একজন।

মণিপ্রসন্ন এর মধ্যে তাঁর কাছে একদিন এক প্রস্তাব করে বসলেন।

'গুপীবাবু, শুনেছেন তো, গভর্নমেন্ট এখন খালি বাড়ি পেলেই রিকুইজিশন করে নিচ্ছে। মনে হয়, আমাদের কাছেও শীগগিরই সে পরোয়ানা আসছে। কাজেই এখন সব গিয়েও যেটুকু আছে তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি চলে আসুন না এখানে। বয়সও তো কম হলো না —একা একা মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছেন, আপনার পক্ষেও তো সেটা বিপদের কথা।'

গুপী দাদুকে কেমন বিবর্ণ দেখাল। সকাতরে বললেন, 'আর কিছুদিন দেখাই যাক না ছোটবাবু।'

পঁয়ষট্টি বছর এই এস্টেটের সঙ্গে থেকে এই প্রথম রাজবাড়ির এক কর্তার কথা অমান্য করলেন গুপী দাদু। এটা মণিপ্রসন্নের কানেও কেমন বেসুরো ঠেকল। তিনি ভুরু কোঁচকালেন। গুপী দাদুও তা বুঝলেন। বুঝেও চুপ রইলেন। বুকের ভেতরটা পাষাণ হয়ে উঠল।

আটান্ন বছর আগে তাঁর স্ত্রী একমাত্র ছেলেকে নিয়ে এখানে বাস করতে আসবে ভেবে কুঁড়েখানা তুলেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই কুঁড়েতেই দিনে দিনে তাঁর সাধের সংসার গড়ে তুলবেন। কিন্তু সে সাধ পূরণ হয়নি। অসহ্য গরমে কষ্ট পেয়েছেন। বৃষ্টির দিনে কুঁড়ে ভেসে গেছে, তবু এ ঘর ছাড়েন নি। মন্দিরের মত সযত্নে একে ধুয়ে মুছে আগলে রেখেছেন। আশা ছিল, এই ঘরেই একদিন শেষ পরোয়ানা নিয়ে আসবে তাঁর মৃত্যুদূত।

মণিপ্রসন্ন এর পরেও কয়েকবার তাগিদ দিয়েছেন। প্রতিবারই বুকের মধ্যে দাদুর কেমন একটা আঘাত লেগেছে। রাজবাড়িতে কম সাহায্য কম আনুকূল্য তো তিনি পান নি, আজ তাঁদের বিপদের দিনের এই অনুনয়-টুকুও তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে, এর চেয়ে বেদনার কথ তাঁর পক্ষে আর কী হতে পারে? কিন্তু সে বেদনার কথা তিনি কাকে বোঝাবেন?

মণিপ্রসন্ন আজকাল আর বিশেষ কথা বলেন না তাঁর সঙ্গে। রাজবাড়িতে আগের মত খাতিরও নেই। দুপুরে মাথা হেঁট করে খেতে যান—খেয়ে আসেন। ছেলেরা বলে, 'দাদু, আজ কী খাওয়া হলো?'

ওদের কাছে কিন্তু দাদু নতি স্বীকার করেন না। মুখ বড় করে নানারকম ভোজ্য বস্তুর নাম গড়-গড়িয়ে বলে যান। কিন্তু তারপরই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বাড়ি ফিরে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাতে থাকেন।

তারপর প্রতিদিনের এই নিয়মে হঠাৎ একদিন ব্যতিক্রম হলো। দুপুরে দাদুকে রাজবাড়িতে যেতে না দেখলেও কেউ অত ভাবে নি। কিন্তু বিকেলে ছেলেরা মাঠে গিয়ে অবাক। এই প্রথম দাদু মাঠে আসেন নি। দাদুর ঘরের দিকে তারা এগিয়ে দেখল ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকিতেও দরজা খুলল না। জানলা দিয়ে দেখা গেল দাদু বিছানায় শুয়ে, ডাকাডাকি তাঁর কানে গিয়ে পেঁছচ্ছে, এমন লক্ষণ নেই। দরজা ভেঙে তাঁকে যখন বাইরে আনা হলো, তখন সে দেহে বিষক্রিয়ার চরম ফল ফলতে শুরু করেছে।

কারও বুঝতে দেরি হলো না, দুধ কলা দিয়ে প্রায় ষাট বছর ধরে যাঁকে দাদু পুজো করে এসেছেন, এবার সে তার ষোল আনা সাধ মিটিয়ে নিয়েছে। কিংবা সে দাদুর ইচ্ছাই পূর্ণ করেছে,তাই বা কে বলতে পারে?

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমরা সানন্দে ঘোষণা করছি যে, রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির (৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭) সৌজন্য ও সহযোগিতার ফলেই কিশোর ভারতীর গত শারদীয় সংখ্যায় (শারদীয়া কিশোর ভারতী, ১৩৭৬) প্রখ্যাত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিরঞ্জন' চিত্রখানি পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। এজন্য সোসাইটির কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। উক্ত শারদীয়া কিশোর ভারতীতেই সোসাইটির নিকট এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের উচিত ছিল। কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ তা সম্ভব হয় নি। এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[পূর্বানুবৃত্তিঃ সুদূর লোধমায় শ্রীলোকনাথ মহান্তীর অতিথি হয়ে এসেছেন মামাবাবু; সঙ্গে আমি ও মঙ্পো। পরদিনই আমি আকস্মিকভাবে করালী পাহাড় আবিষ্কার করেছি। মিঃ নাগাপ্পার মুখেই শুনেছি, আদিবাসীদের কাছে অতি পবিত্র ঐ পাহাড়ে বিশেষ পরবের দিনে ছাড়া উঠলে সর্বনাশ অনিবার্য। ঐ দিনই দূর গাঁয়ের এক আদিবাসী মারফত মহাবুয়াং-এর জঙ্গলে এক বুনো হাতীর মানুষ পিষে মারার খবর পেয়ে ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা বন্ধ রাখতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্যান্টশার্ট পরা একজনকে করালী পাহাড়ের মাথায় দেখা গেছে। রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছে যখন মামাবাবু জানিয়েছেন, জঙ্গলে আদিবাসী চাপরাশীর মৃত্যুর কারণ হাতী নয়—হাতীটা কোন দিনই নাকি ও তল্লাটে আসেনি। মহাবুয়াং থেকে যে শিকারী নাগাপ্পার কাছে আসছেন, তাঁরই রিপোর্ট ওটা। নাগাপ্পার নামটা শুনে, কেন জানি না, চমকে উঠেছি। সরজমিনে তদন্ত করে আদিবাসী-মৃত্যু-রহস্যের কিছু খেই পাওয়া যেতে পারে ভেবে বঙ্কুবাবুকে নিয়ে এক সকালে দূরের সেই জংলা পাহাড়ে গেছি। খুনের জায়গাটা দেখতে এসে যা সেদিন দেখলাম, তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।]

যেখানে পাথুরে ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান থেকে দূরের পাহাড়ী-প্রান্তরে একটা লোককে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। মানুষটি মাটির ওপর উবু হয়ে বসে কি যেন করছে। কি করছে এতদূর থেকে তা বোঝা না গেলেও মানুষটাকে নিজের কাজে তন্ময় বলেই মনে হল।

লোকটি আমাদের দিকে পিছু ফিরেই বসেছিল, কিন্তু তাতেও তাকে চেনবার জন্যে চোখে দূরবীন তোলবার দরকার হল না।

চেহারা পোশাকের আদল থেকেই লোকটির পরিচয় তখন আমি নির্ভুলভাবে বুঝে ফেলেছি। বোঝবার বিশেষ কারণ এই যে আগের দিন মামাবাবুর কাছে কটি অদ্ভুত খবর শোনবার পর থেকে এই লোকটির কথাই সারাক্ষণ ভাবছিলাম।

হ্যাঁ, মামাবাবুর কাছে যার নাম শুনে অজান্তেই চমকে ওঠবার কারণটা গতকাল প্রথমে ঠিক বুঝতে পারি নি, ইনি সেই নাগাপ্পা।

পুরো একটা দিন মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে নাগাপ্পা সম্বন্ধে বেশ কিছু রহস্যের খেই তখন পেয়ে গেছি।

লোধমা পাহাড় থেকে দূরবীনে আদিবাসীদের করালী পাহাড়ে সেদিন যে এই নাগাপ্পাকেই উঠতে দেখেছিলাম এ বিষয়ে আমার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু এই একটা ব্যাপারই নয়, নাগাপ্পার গতিবিধির মধ্যে সন্দেহজনক আরো কিছু আছে।

প্রথম দিন করালী পাহাড়ে তার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই ত অদ্ভুত। আমি না হয় খুব ভোরে উঠে

বেরিয়ে যাওয়ার দরুন ক্ষ্যাপা হাতীর খবর আর লোধমা পাহাড় থেকে কোথাও যাবার নিষেধের কথা জানতে পারি নি, কিন্তু নাগাপ্পা ত এ খবর আগের রাত্রেই পেয়েছেন। মহান্তী লোধমার সব ছাউনিতেই ত ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

নাগাপ্পা সে নিষেধ অমান্য করে পরের দিন সকালেই তাহলে বার হয়েছিলেন কেন?

তাঁর সঙ্গে সেদিন যখন দেখা হয় তখন তিনি নিজের ছাউনিতে ফিরছেন। তার মানে আমার চেয়েও ভোরে তিনি লোধমা পাহাড় থেকে বেরিয়েছিলেন। মহান্তীর নিষেধ এভাবে অমান্য করে অত ভোরে বেরিয়ে যাবার কারণটা কি!

দেখা হবার পর তাঁর আর একটা ব্যবহারও অদ্ভুত। তিনি আদিবাসীদের 'এঞ্চা' পাহাড়ের পরিচয় দিয়ে সেখানে ওঠা সম্বন্ধে আমায় সাবধান করেছিলেন, কিন্তু ক্ষ্যাপা হাতীর ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও ত আমায় জানান নি!

নাগাপ্পা সম্বন্ধে এত কথা সে মুহূর্তে অবশ্য ভাবিনি।

অত তন্ময় হয়ে নাগাপ্পা কি করছেন সেইটেই তখন গভীর কৌতূহলের বিষয়।

আমাদের এখন কি করা উচিত, সেটাও ঠিক করতে পারছিলাম না।

সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে নাগাপ্পার সামনে হাজির হবার বাধা কিছু নেই।

নাগাপ্পা যদি আসতে পেরে থাকেন তাহলে আমরাই বা এ পাহাড়ে টহল দিতে আসতে পারব না কেন? সোজা গিয়ে দেখা দিয়ে নাগাপ্পা কি করছেন জিজ্ঞাসাও করা যায়।

নাগাপ্পা তাহলে কি করবেন?

যা তিনি করছেন তা খুব প্রাণ খুলে জানাবার কাজ নিশ্চয় নয়। সুতরাং আমাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশী বোধহয় তিনি হবেন না।

কিন্তু অসন্তোষটা কি চেহারা নেবে তারপর?

বেশ একটু অসুবিধেয় পড়লেও একটা কিছু ঝুটো কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি ব্যাপারটা নির্দোষ বলে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন কি? তা করা-ই সম্ভব।

তা যদি করেন তাহলে লোকসান কিছু নেই। তাঁর কৈফিয়ৎটা মেনে নেবার ভান করে আমরা আসল রহস্যটা তারপর সন্ধান করবার চেষ্টা করতে পারি।

কিন্তু নাগাপ্পার প্রতিক্রিয়াটা গোড়াতেই সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

ছোট খাটো অপরাধ নয়, রীতিমত একটা মানুষ খুনের ব্যাপার। সে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে একটা দৈব দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবার যে কৌশল করা হয়েছে তার ভেতরেও দারুণ শয়তানী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এ সব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে নাগাপ্পার সত্যিই যদি গোপন সংশ্রব থাকে তাহলে তিনি এ জায়গায় আমাদের হঠাৎ উদয় হতে দেখে শুধু একটু মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিয়ে সাধু সাজবার চেষ্টা নাও করতে পারেন।

এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর অবশ্য আর নেই। এ সময়ে এখানে তাঁর লুকিয়ে আসা-ই তার প্রমাণ।

এ অবস্থায় তাঁর গোপন কাণ্ডকারখানার অবাঞ্ছিত সাক্ষী হিসেবে আমাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ব্যবস্থার কথা তাঁর মনে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

আমরা গুনতিতে দুজন। কিন্তু দুজনেই নিরস্ত্র, তার ওপর বঙ্কুবাবু ত যাকে বলে একেবারে শূন্য,—সহায়ের বদলে দায়।

নাগাপ্পার মত মানুষ এখানে শুধু হাতে নিশ্চয় আসেন নি। তা ছাড়া হাতে একবার খুনের রক্ত যার লাগে, দ্বিতীয়বার সে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলেই জানি। আদিবাসী চাপরাশীর থেঁৎলানো দেহটা যেখানে পাওয়া গেছে তারই কাছাকাছি আর দুটো লাশ রেখে দিয়ে যেতে নাগাপ্পার মত মানুষের দ্বিধা সঙ্কোচ খুব বেশী সুতরাং হবে না।

আমাদের মত দুটো বেয়াড়া সাক্ষীর মুখ চিরকালের মত বন্ধ করে দেওয়ার এমন সুযোগই বা নাগাপ্পা ছাড়বেন কেন?

এই নির্জন পাহাড়ে কোথায় কি হচ্ছে কেউ দেখবার নেই। পিস্তল ছুঁড়ে যদি কেউ আমাদের খতম করে তার শব্দটা পর্যন্ত পাহাড়ের এ ঢাল ছাড়িয়ে ওদিকের আদিবাসীদের গ্রামটা পর্যন্ত পৌঁছোবে না।

মনে মনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই এতগুলো যুক্তি সাজিয়েও নিজেকে সামলানো শক্ত হয়ে উঠল।

এত বড়ো একটা সুযোগ পেয়েও নাগাপ্পাকে শুধু দূর থেকে লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। সামনা সামনি গিয়ে উপস্থিত না হই, নাগাপ্পা অত তন্ময় হয়ে কি করছেন, আরো একটু কাছে গিয়ে লুকিয়ে না দেখাটা লজ্জাকর কাপুরুষতা বলে মনে হল।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বঙ্কুবাবুকে নীরব থাকবার

ইসারা করে পাথুরে ঢিবিগুলোর পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে দু পা-র বেশী কিন্তু এগুতে পারলাম না।

পেছন থেকে লম্বা সিড়িঙ্গে হাত বাড়িয়ে বঙ্কুবাবু আমার একটা পা তখন ধরে ফেলেছেন। চমকে ফিরে তাকিয়ে তাঁর মুখ চোখের যে চেহারা দেখলাম তা ভোলবার নয়।

সেখানে করুণ মিনতি, না হতাশ আতঙ্ক, না আমার আহাম্মকিতে অক্ষম রাগ, কোনটা ফুটে উঠেছে বোঝা শক্ত। সব কটা ভাবই বোধহয় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বঙ্কুবাবু অমন করে ধরে ফেলায় চমকে ওঠার সঙ্গে বেশ একটু গরমই প্রথমে হয়ে উঠেছিলাম। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই তিনি কত বড় উপকার যে করেছেন তা টের পেলাম।

পাথুরে ঢিবির আড়ালেই তখনো দুজনে আছি। বঙ্কুবাবুর ধরা, আর আমার দু পা গিয়ে ফিরে দাঁড়ানতে নিচের শুকনো ঝরা পাতায় শব্দ যা হয়েছে তা নামমাত্রই বলা উচিত।

কিন্তু নাগাপ্পা শয়তান গোছের মানুষ বলেই বোধ হয় তাঁর কান শিকারীর মত সজাগ।

দুটো বড় পাথুরে ঢিবি আর তার সামনের একটা চারা শাল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নাগাপ্পাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম ওই সামান্য শব্দেই তিনি হুঁশিয়ার হয়ে ফিরে বসেছেন। শুধু ফিরে বসেন নি, ডান হাতটাও তাঁর আমাদের এই পাথুরে ঢিবিগুলোর দিকেই তোলা। ভালো করে এত দূর থেকে দেখা না গেলেও তাতে একটা পিস্তলই ধরা আছে বুঝলাম।

পাথুরে ঢিবি দুটোর আড়ালে সামনের ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে আমাদের দেখতে পাওয়া নাগাপ্পার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তিনি শুধু শুকনো পাতার ওপর আমাদের ক্ষণিকের নড়াচড়ার শব্দই পেয়েছেন, কিন্তু তাইতেই অতটা অস্থির উত্তেজিত হয়ে তাঁর পিস্তল উঁচিয়ে ধরাটাই বেশ একটু অস্বাভাবিক নিশ্চয়। শুধু বন্য কোন জন্তুর ভয়েই কি এই উত্তেজিত হুঁশিয়ারী? সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত। এসব অঞ্চলে হিংস্র শ্বাপদ নেই এমন নয়। কেঁদো না হোক্ চিতা আর ভালুকের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এখন সব কিছু উল্টে গেলেও প্রথমে সেই শিকারের লোভেই এখানে এসেছিলাম।

কিন্তু সে সব শিকারের জানোয়ারের ত এই দুপুর বেলায় এ রকম পাহাড়ের মাথায় হানা দিতে আসা প্রায় অসম্ভব। নাগাপ্পার অমন সজাগ সতর্কতার লক্ষ্য অন্য কিছু বলেই তাই মনে হল।

অনুমানে যে ভুল হয়নি তৎক্ষণাৎ তার অস্বস্তিকর প্রমাণ পেলাম। নাগাপ্পা হঠাৎ উঠে পড়ে হিংস্র শ্বাপদের তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়েই সন্তর্পণে এক-পা এক-পা করে আমাদের ঢিবিটার দিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করলেন। পিস্তলটা ডান হাতে আগের মতই উঁচানো।

আমাদের অবস্থা তখন যে কি তা বোঝানো শক্ত। কি যে করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে অস্থির যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তখন অসহ্য হয়ে উঠছে।

যেভাবে নাগাপ্পা এগিয়ে আসছেন তাতে মিনিট পাঁচেক বাদেই ত আমাদের ঢিবিটার কাছে পৌঁছে যাবেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে এখানেই লুকিয়ে থাকব, না ছুটে পালাব এখন-ই?

পিস্তলের লক্ষ্যভেদ খুব শক্ত বলে জানি। সেই ভরসায় এখনই ছুটে পালালে হয়ত গুলি খেয়ে মরার পরিণামটা এড়াতে পারি।

কিন্তু সত্যিই কি নাগাপ্পা আমাদের মারতে পিস্তল ছুড়বেন? সভ্য জগতের মানুষ হয়ে সে কথাটা মন সহজে বিশ্বাস করতেই চায় না। ছুটে পালান বা চুপ করে লুকিয়ে থাকার বদলে এখনই উঠে দাঁড়িয়ে নাগাপ্পাকে দেখা দেবার কথাও তাই একবার মনে হল। বঙ্কুবাবুর দিকে ফিরে তাঁর মনের অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করলাম। চোখের আর হাতের ইসারায়, উঠে দাঁড়িয়ে দেখা দেবার প্রস্তাবটাও চাইলাম তাঁকে বোঝাতে।

বুঝতে পারুন বা না পারুন তিনি হাত নাড়ার ইঙ্গিতে অত্যন্ত কড়া ভাবে যেমন আছি তেমনি নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেই বললেন বলে মনে হল।

বোকাসোকা পেটুক ভালোমানুষ হলে কি হয় বঙ্কুবাবুর ভেতরের চোখ যে আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পেলাম। তাঁর বারণ না মানলে এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত সেদিনই হয়ে যেত এটুকু এখন বলতে পারি।

উঠে দেখা দেওয়া বা ছুটে পালান, দুটোর কোনোটাই না করে পাথুরে ঢিবির ফাঁক দিয়ে তখন নাগাপ্পাকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে লক্ষ্য করছি।

নাগাপ্পা আরো কয়েকটা পা এগিয়ে এলেই আমাদের দেখতে পাবেন এইটেই তখন ভয়।

কিন্তু নাগাপ্পা আচমকা যা করে বসলেন সেইটেই অপ্রত্যাশিত। এগিয়ে আসতে আসতে নাগাপ্পা হঠাৎ পিস্তলটা ছুড়ে বসবেন এটা সত্যিই ভাবতে পারি নি।

একবার নয় দু-দুবার নাগাপ্পা সামনের দিকে আমাদের ঢিবিটার মাথা ডিঙিয়েই পিস্তল ছুড়লেন। গুলিগুলো বৃথাই অবশ্য খরচ হ'ল।

যা ভেবেছিলাম সেই মত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেখা দিলে কি যে হত তা ভালো ভাবেই অনুমান করে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তখন নাগাপ্পার পরের গুলির জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাগাপ্পা কিন্তু আর গুলি ছুড়লেন না, এগিয়েও এলেন না আর আমাদের দিকে। যেভাবে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সামনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে তিনি আবার আগেকার জায়গায় ফিরে গেলেন তাতে আগের সন্দেহটা ভুল বলেই তিনি বুঝেছেন বলে মনে হ'ল।

নাগাপ্পা ফিরে যাওয়ায় তখনকার মত হাফ ছেড়ে অবশ্য বাঁচলাম কিন্তু সেদিনকার বিপদ সবে যে তখন সুরু তা কি জানি!

(ক্রমশঃ)

• গল্পের যাদুঘরে •

বুমেরাং

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার সিনেমা দেখতে গেছেন। পায়ে তাঁর সদ্যকেনা শখের চটিজুতো। সিনেমা দেখার শেষে তার একপাটি আর খুঁজে পেলেন না। ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোন চোর তাড়াতাড়িতে চুরি করতে গিয়ে একপাটি নিয়েই পালিয়েছে। বেটা বোধহয় আশেপাশেই লুকিয়ে আছে সুযোগ বুঝে আরেক পাটি বাগাবার লোভে। চোরটাকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি একটা বুদ্ধি ঠাওরালেন।

উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের বিস্মিত করে দিয়ে ঐ পাটিটা বগলদাবা করেই তিনি বাড়ি রওয়ানা হলেন, চললেন গঙ্গার দিকে। তারপর ওটাকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে মনে মনে হয়ত বা বললেন—মা গঙ্গা, চোরটাকে জব্দ করে তোমার গর্ভে আমার এই ক্ষুদ্র শখের বস্তুটি বিসর্জন দিচ্ছি।

পরের দিন সকালবেলায় শরৎচন্দ্র বৈঠকখানায় বসে পুলকিত চিত্তে গড়গড়া টানছেন। মনে মনে বোধহয় ভাবছেন আগের দিনের চটি চুরির কথা। কি জব্দই না হয়েছে চোরটা! বেটার খুব শিক্ষা হল যা হোক! এমন সময় একটা কাগজের মোড়ক হাতে একজন উর্দিপরা লোক এসে তাঁকে প্রণাম করল।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, এত সকালে কি ব্যাপার?

লোকটা বললে—আজ্ঞে, আপনার কাছেই এসেছি। এটা—

শরৎচন্দ্র—কি এটা?

লোকটা—আজ্ঞে, এটা আপনার হারিয়ে যাওয়া সেই একপাটি চটিজুতো।

শরৎচন্দ্র—অ্যাঁ, বল কি! পেলে কোথায়?

লোকটা—আজ্ঞে, সিটের নিচে। আপনি যে সিটে বসেছিলেন তার তলায়।

বলে সে মোড়কটা খুলে দেখাল। হ্যাঁ, সেই শুঁড়তোলা শখের চটির একপাটিই বটে!

চোরকে জব্দ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই তখন ভীষণ জব্দ হয়েছেন। কিন্তু করারও আর কিছু নেই। লোকটাকে তিনি বললেন—ভালই হল বাপু। কাল আসবার পথে মা গঙ্গাকে একটা পাটি দিয়ে এসেছি, এবার তুমি ফিরবার পথে একটু কষ্ট করে এ পাটিটাও তাঁকে দিয়ে যেও।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সিংখুড়োর শিক্ষা পরিকল্পনা

বিমল দত্ত

কয়েকদিন ধরে রায় বাহাদুরের বৈঠকখানায় তক্তপোশ ফাটাফাটি তর্কবিতর্ক। 'আজকালকার ইস্কুলে কিস্যু হচ্ছে না', 'মাস্টারগুলো ফাঁকিবাজ', 'আমার ছেলেটা মেরিটোরিয়াস্, পাঁচ বারোভূতে তাকে নষ্ট করলে' ইত্যাদি আলোচনা চলেছে, আর কি করে ছেলেদের সত্যিকারের শিক্ষা দেওয়া যায় সে বিষয়েও জোর চলেছে গবেষণা।

হঠাৎ সেই সভায় একদিন সিংখুড়ো উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, তাকিয়াটায় মাথা ঠেস দিয়ে বললেন, "দেখ রায় বাহাদুর, ভেবে দেখলুম শিক্ষাসম্বন্ধে ঐ সার্জেনের পরিকল্পনাটাই ঠিক—"

বাধা দিয়ে রায় বাহাদুর বললেন,"সার্জেন্ট পরিকল্পনা, সার্জেন পরিকল্পনা নয়।"

সিংখুড়ো ঠেলে উঠলেন, "আজ্ঞে না, সার্জেন পরিকল্পনা—সার্জেন্ট পরিকল্পনা বর্তমানে বাতিল—আউট্ অফ্ ডেট্। তাছাড়া নতুন আরেকটা পরিকল্পনার কথাও খুব উঠেছে—অ্যাস্ট্রলজিক্যাল পরিকল্পনা—"

সবাই থ বনে বসে রইল। সিংখুড়ো শুরু করলেন, "ডাক্তার হিঙ্গলবার্গের নাম শুনেছেন? খাস জার্মান—বিখ্যাত সার্জেন। তাঁর পরিকল্পনার কথাই বলছি। চাই বিলকুল অপারেশন। সেরিব্রাল টিউমার—বড় বড় গেঁড় জন্মাচ্ছে আধুনিক ছেলেদের মাথায়—খেলাধুলোর গেঁড় আর সিনেমার গেঁড়। তাতেই মস্তিষ্ক ভর্তি, মাথায় অন্য বিষয় ঢুকবে কি—স্থানাভাব! তাই ডাক্তার হিঙ্গলবার্গ স্কুলের ছেলেদের ব্রেন অপারেশন করছেন। জার্মানীতে আশ্চর্য ফল ফলছে।"

পণ্ডতীর্থ পণ্ডিত বললেন, "ঠিক, যথার্থ। আমার মধ্যম পুত্র নীলমণি সেদিন সিনেমা দেখার জন্যে আমার মানিব্যাগ থেকে টাকা চুরি করেছে। ওর মাথার সিনেমা-গেঁড়টা আগে অপারেশন করাতে হবে।"

রোহিণী কারফর্মা বললে, "জার্মানদের সবই অদ্ভুত, অভিনব। ঠিক ধরেছে রোগটা। বিশ্বব্যাপী রোগ।"

দেবশর্মা বললে, "আপনার অ্যাস্ট্রজিক্যাল পরিকল্পনাটা কি?"

সিংখুড়ো বললে, "এটা আমাদের ভারতীয় তামিল পণ্ডিত ডামাডুড্ডুল ডেল্ভার—তাঁর পরিকল্পনা। এঁর মতে, ছেলে জন্মালেই তার জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠি-পত্র তৈরি করে সেই অনুযায়ী তাকে স্কুলে বা চাষবাসের কাজে বা কলকারখানায় পাঠাতে হবে। যে উকিল হবে তাকে আমরা মিস্ত্রী বানাচ্ছি, পণ্ডিতকে চাষের কাজে

দিচ্ছি, কতটা জাতীয় প্রতিভার অপচয় ভাবুন ত!"

রায়বাহাদুর বললেন, 'আপনি তা কি বলেন?'

সিংখুড়ো বললেন, "আমার সঙ্গে নানা দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়। আমি একটা পরিকল্পনা করেছি—"

বিল্বমঙ্গলবাবু বললেন, "সেই মাস্টারী কল বা কলের মাস্টার?"

সিংখুড়ো বলে উঠলেন, "না—না, সে সব মান্ধাতা আমলের যান্ত্রিক শিক্ষা আজকাল অচল। এখন চাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বা নিউক্লিয়ার শিক্ষা, যাকে বলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক এডুকেশন।"

সবাই থ। শুধু অধ্যাপক সামন্ত মন্তব্য করলেন, "আপনি কি চাঁদে নেমেছিলেন নাকি সিংখুড়ো?"

সিংখুড়ো গম্ভীরভাবে বললেন, "না, এখনো নামিনি, তবে হয়ত একদিন ভারতীয় রকেটে করে যেতেও পারি।"

অধ্যাপক সামন্ত বললেন, "সেখানে নাকি অনেক আধুনিক মত হাওয়ায় উড়ছে।"

রায়বাহাদুর বললেন, "ঠিক বুঝলুম না, প্রোফেসর সামন্ত। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

সামন্ত বললেন, "চাঁদে কেবল ধোঁয়া আর গ্যাস—এসব পৌঁছচ্ছে পৃথিবী থেকে। পৃথিবীর যত রাজ্যের আজগুবি, উদ্ভট মত সব সোজা চাঁদে উঠে যাচ্ছে আর সেখানে ঘুরপাক খাচ্ছে......"

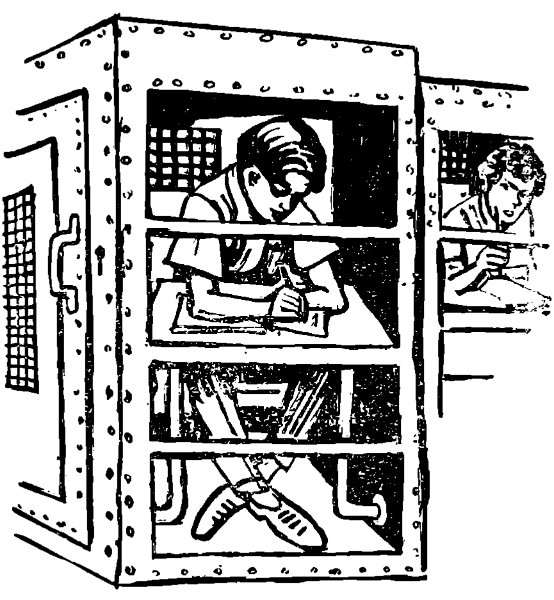

......ইস্পাতের খোপের মধ্যে বসে ছেলেরা পরীক্ষা দেবে।

রায়বাহাদুর বললেন, "সে যা হোক সিংখুড়ো, আপনি আপনার পরিকল্পনাটা একটু শোনান।"

সিংখুড়ো গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, "অতি সহজ পরিকল্পনা, তবে তা বোঝার আগে অন্য দু' একটা কথা আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমাদের ছেলেমেয়েদের চাই প্রচুর খাদ্য এবং প্রচুর ঘুম। স্কুলে ছ' ঘণ্টা পড়ে ছেলে এক গণ্ডা ফোচ্‌কা খেয়ে ক্ষিদে মেটাবে, বা এক পাতা আলুকাবলী বা এক পাতা ঘুঘ্‌নি—এর মত অবাস্তব আর কিছু হতে পারে না। তাই চাই স্কুল-লাইব্রেরীর পরিবর্তে স্কুলে খাদ্য-ভাণ্ডার —বিস্কুট, কেক, পাউরুটি, পুডিং, খেজুর, আখরোট, বাদাম এইসব দিয়ে খাদ্যভাণ্ডার ভর্তি রাখতে হবে। প্রতি ঘণ্টায় ছেলেরা পকেট ভর্তি পছন্দ মত খাবার নিয়ে যাবে আর খুশী মনে খেতে খেতে পড়া শুনবে।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সিংখুড়ো ধমক দিলেন, "নো হি-হি, হো-হো! করে দেখুন, পরে বলবেন। তাছাড়া অধিকাংশ ছেলে ঘুম-কাতুরে, ক্লাশে ডেস্কে বা বেঞ্চিতে মাথা রেখে ঘুমোয়। তাই আমার পরিকল্পনা প্রতি স্কুলের প্রতি তলায় একটা করে ডানলোপিলো দেওয়া ঘুমোবার ঘর থাকবে। যার ঘুম পাবে সে সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে।"

রায়বাহাদুর বললেন, "শিক্ষকদের ঘুম পেলে?"

সিংখুড়ো বললে, "স্কুলে শিক্ষক থাকবে না। রেকর্ডারে রেকর্ড বাজবে প্রতি ক্লাশে, দারোয়ান একজন থাকবে ছেলেদের ওপর নজর রাখবার জন্যে।"

অধ্যাপক সামন্ত বললেন, "শিক্ষকরা কি করবেন?"

"তাঁরা গবেষণা করবেন আর উপযুক্ত হলে তাঁদের বার্ষিক ভাতা দিয়ে তাঁদের বক্তৃতা টেপ করা হবে।" বলতে বলতে সিংখুড়ো উঠে দাঁড়ালেন।

রায়বাহাদুর বললেন, "পরীক্ষার ব্যাপারটা কি হবে?"

সিংখুড়ো বললেন, "পরীক্ষার হলে লোহার টেবিল চেয়ার থাকবে মেঝের সঙ্গে গাঁথা, যাতে ছেলেমেয়েরা ভাঙতে না পারে। তাছাড়া পরীক্ষার হলঘর সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈরি করতে হবে—ছোট ছোট ইস্পাতের খোপের মধ্যে বসে ছেলেরা পরীক্ষা দেবে। তা থেকে তিন ঘণ্টার আগে বেরুতে পাবে না। ভয়েস ট্যাবলেট খাইয়ে তাদের তিন ঘণ্টার জন্যে বোবা বানিয়ে ফেলা হবে।"

রায়বাহাদুর বললেন, "কিন্তু আপনার শিক্ষা-ব্যবস্থাটা যান্ত্রিক হয়ে পড়লো না কি?"

"যান্ত্রিক হলেও বৈজ্ঞানিক এবং স্ট্র্যাটোস্ফেরিক!" চটি ফট্‌ফটাস্ করতে করতে সিংখুড়ো বেরিয়ে গেলেন।

খোকনের জয়

রাম চট্টখুণ্ডী

তুমি বুঝি মা ভাবছো মনে
থাকবো বসে ঘরের কোণে
ভয়ে ভয়ে তোমার আঁচল ধরে?
বাবার মতো বড় হলে
এ ঘর ছেড়ে যাবই চলে
দেখবো, ধরে রাখ কেমন করে!

দেখবে, আমি রকেট নিয়ে
নামবো সোজা চাঁদে গিয়ে
অনেক নীচে দেখবো আমার গ্রাম,
দেখবো, তুমি তুলসী-তলে
প্রদীপ-হাতে কাপড় গলে
করজোড়ে করছো ঠাকুর নাম।

চাঁদ হতে মা দেখবো বেশ
এই পৃথিবীর সকল দেশ
মানুষগুলো পুতুল মনে হবে,
কেউ পাবে না দেখতে মোরে
হয়তো আমি গেছি মরে—
এমনি কতো ভাবছো বসে সবে।

চাঁদের পুরী দেখার শেষে
ফিরবো যবে আপন দেশে
সবার আগে কাছে এসে তুমি
মাথার পরে বুলিয়ে হাত
করবে মোরে আশীর্বাদ
বুকের মাঝে নেবে আমায় চুমি।

বলবে, "আমার খোকন আজ—
কীর্তি রাখে বিশ্বমাঝ
এমন ছেলে কটা লোকের হয়?"
ঠান্‌দি এসে চিবুক ধরে
বলবে আমায় আদর করে—
"জয়—আমাদের খোকামণির জয়!"

লাক

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

হবু রাজা টিকিট কাটেন
মিলবে দু'চার লাখ,
বছর দশেক পরে দেখেন
পকেট চিচিং ফাঁক!

টাকার শোকে চুল উঠে যায়
মাথায় পড়ে টাক,
হবু বলেন— কেমন হল?
গবুর পড়ে ডাক।

মন্ত্রী বলেন—ভাবেন মিছে,
টাকার বদলি টাক—
একেই বলে 'ভাগ্য', হুজুর,
ইংরাজীতে 'লাক'।

কাক-সংবাদ

শুচিস্মিতা দাশগুপ্তা

কা কা কা!
সকাল থেকে ডাকছি খালি,
সবার আমি চোখের বালি।
আদর করে কেউ ডাকে না কাছে,
তাড়ায় সবাই নোংরা আনি পাছে।

কা কা কা!
রংটা আমার বড্ড কালো,
কেউ বলে না দেখতে ভালো।
ডাকটা শুনে সবাই বলে ভাগ্,
বিচ্ছিরি আর নোংরা আমি কাক।

কা কা কা!
এঁটোকাটা করি যে সাফ,
তবু আমার এই অভিশাপ।
জানি কোথাও সুনাম নাহি পাব,
তবু যা কাজ করেই আমি যাব।

গুণ করে খাই

সৌরেন্দ্রমোহন বসু

এই হাতে দুই আর এই হাতে চার
এই দ্যাখো বড়ো বড়ো মিঠে দানাদার।
দানাদার আনা দরে তবু ভাবি ভাই,
যোগ না বিয়োগ-ভাগ-গুণ করে খাই।

যোগ করে খাই যদি হবে তবু ছয়
বিয়োগ করলে ভাই দুই মোটে হয়;
ভাগ করে খাবো ভাবি, হবে সেও দুই
এধারে খিদেতে করে পেট চুঁই চুঁই।

গুণ করে দেখি শেষে দুই আর চার
আহ্লাদে আটখানা হলো দানাদার।
তবে আর বসে কেন ভেবে মরি ভাই,
গুণ করে দানাদার পেট ভরে খাই।

আঁটুল্ বাঁটুল্

রবীন্দ্রনাথ রায়

আঁটুল্ বাঁটুল্ শ্যাম্লা সাঁটুল্-শ্যাম্লা গেছে কোথা,
শ্যাম্লা গেছে চাঁদের দেশে তুলতে মাণিক পোঁতা।
কিনতে সুতো চরকা-কাটা চাঁদের মায়ের হাতে—
চিক্ চিক্ চিক্ জরির ঝলক রুপোলী ঝরনাতে।

আঁটুল্ বাঁটুল্ শ্যাম্লা সাঁটুল্—শ্যাম্লা গেছে বুঝি
অথৈ অথৈ সমুদ্দুরের আনতে কেড়ে পুঁজি।
শ্যাম্লা গেছে মোচার খোলার নাগরদোলায় চড়ে
বিষ-হাঙ্গরের লেজের ঝাপট ভাঙ্গতে গায়ের জোরে।

আঁটুল্ বাঁটুল্ শ্যাম্লা সাঁটুল্—শ্যাম্লা যাবে হাটে,
সওদা যে তার জগৎ-জোড়া—নৌকো নানান্ ঘাটে।
পাহাড়-চূড়ার বরফ আছে, সাগর-তলের মণি,
চাঁদ-সূর্যির বুকের থেকে ছিনিয়ে আনা খনি।

স্বপ্নের রাজ্যে

সঞ্জিতকুমার সাহা

পথ চলতে কুড়িয়ে পেলাম
একটি সোনার দানা,
সোনার দানায় লেখা আছে—
বেল কুড়োতে মানা।

বেল কুড়োতে গিয়ে দেখি,
বেলের গাছে আম,
আমার আসা দেখে হাসে
প্রতিবেশীর জাম।

জামতলায় গিয়ে দেখি
জামের গাছে ডুমুর,
ডুমুর কোথা, খেঁকশেয়ালি
নাচছে ঝুমুর ঝুমুর॥

ঠাম্মা এসো, আমরা তোমায় গান শোনাই

সুশীল মণ্ডল

চাঁদের দেশের রূপকথা আর বলবো না ঃ
চাঁদের দেশে চরকা বুড়ির নেই কো ঠাঁই
ওসব মিথ্যে হাজার যুগের ভাঁওতা সব
ঠাম্মা এসো, আমরা তোমায় গান শোনাই!

কঠিন শিলায় চাঁদের দেশে নেই কো প্রাণ
নেই কো সেথায় শিউলি বকুল শুভ্র কাশ
ঠাম্মা তুমি যাও ভুলে সেই দিনগুলো
দূর করে দাও মিথ্যে জানার দীর্ঘশ্বাস।

চাঁদের দেশের রূপকথা আর সত্যি নয়
বিশ শতকের বিশ্বটাকে জানতে চাই
ঠাম্মা তুমি দাও বাড়িয়ে হাতটাকে
আমরা এসো এক জোটে সব কোরাস গাই!

লোভ

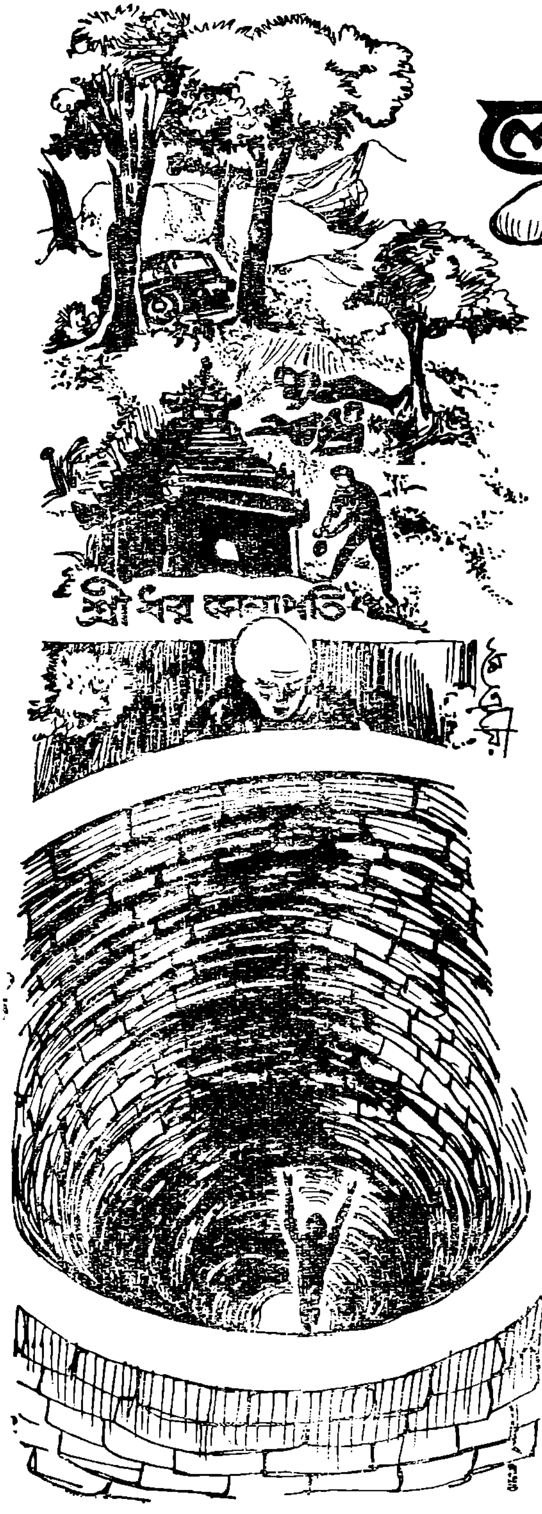

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরই অনিমেষ আবার বার্মায় ফিরে গিয়েছিল। আবার নতুন করে চাকরীর জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল সরকারী বেসরকারী নানান প্রতিষ্ঠানের কাছে। কয়েক জায়গা থেকে ইন্টারভিউ দেবার ডাকও এসেছিল। কিন্তু অনিমেষের বরাত বোধহয় নেহাতই মন্দ। যথারীতি ইন্টারভিউ ঠিকই দিয়ে এল সে, কিন্তু চাকরীর নিয়োগ-পত্র একটিও এল না। অনিমেষের আগে প্রয়োজন একটা চাকরী সংগ্রহ করা। তারপর অন্য একটা গোপন উদ্দেশ্য সাধন করতে চায় ও।

চাকরী পাওয়া সম্পর্কে সে যখন নিরাশায় ভুগছে, ঠিক সেই সময়ে একদিন সংবাদপত্রে আর একটা নতুন চাকরীর বিজ্ঞাপন ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কিছুটা হয়তো বা নতুন করে আশাও জাগলো ওর মনে।

বার্মা সরকারের জরীপ বিভাগ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে। সীমান্তের দিকে পর্বত-সংকুল বনাঞ্চল সম্পর্কে যার একটু অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং জরীপের কাজ জানে—জরীপ-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারের তেমন এক ব্যক্তিকে প্রয়োজন।

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত পাঠাল। আর আশ্চর্য! ইন্টারভিউ দেবার জন্যে ডেকে পাঠানো হলো প্রায় ততোধিক তৎপরতার সঙ্গে।

সাক্ষাৎকারের সময়ে ইঞ্জিনিয়ারের এক প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ বললে, 'যুদ্ধের আগে আপার বার্মার মোগকে বার্মা মাইনিং করপোরেশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-রূপে আমি কাজ করতাম। বর্মী ভাষাতেও আমি কথা বলতে পারি।'

ইঞ্জিনিয়ার জিজ্ঞাসা করলো, 'মাইনিং করপোরেশন ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?'

'শুধু আমি নই, সব কর্মীই ছেড়ে দিয়েছিল।' উত্তর দিলে অনিমেষ, 'দশমাইলের মধ্যে তখন জাপানী সৈন্যরা এসে পড়েছে। তারা দ্রুত এগিয়ে আসছিল। তাই রেলপথে মান্দালয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার আগেই

বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ এবং শিশুদের রেঙ্গুনে সরিয়ে দেওয়া হলো। সবশেষে একটা গাড়ি নিয়ে আমরা পালাই। কিন্তু একজায়গায় এসে আমাদের গাড়ির তেলও ফুরিয়ে গেল। তখন পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চিন্দুইন পর্যন্ত একটা প্রায়মরুভূমির মতো অঞ্চল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়েছিল আমাদের। আমরা বলছি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত আমি একাই ছিলাম। আমাশয়, ম্যালেরিয়া ও অনাহার আমার দলের আর সবাইকে শেষ করে ফেলেছিল। সেবার ও অঞ্চলে বর্ষার আগমন ঘটতেও বেশ দেরি হয়।'

'কতদিন ধরে হেঁটেছিলেন?'

'একটানা তা প্রায় মাসতিনেক।'

'তারপর?'

অনিমেষ বললে, 'তারপর আসামে পৌঁছে যাই। কারা যেন তখন আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। সুস্থ হয়ে উঠে কলকাতা চলে গিয়েছিলাম। যুদ্ধও থেমে গেল। ব্যবসা-ট্যাবসা করে টাকাপয়সা নষ্ট হয়ে যাবার পর আবার বার্মায় চলে এসেছি। আজন্ম বার্মাতেই মানুষ আমি। যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে জাগে। বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের সঙ্গে পাহাড়-জঙ্গল-মরুভূমি পেরিয়ে প্রাণের ভয়ে নিরাপদ একটা জায়গার সন্ধানে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। পথের মধ্যেই একে একে সবাই আমাকে ফেলে রেখে মৃত্যুমুখে পা বাড়ালো। কেন জানি না, সেইসব দুর্গম অঞ্চল জরীপ করতে যাওয়া হবে—এ খবর আমাকে অস্থির করে তুলেছে। সেদিনের কথাগুলো বেশী করে মনে পড়ছে। সুযোগটা যদি আমাকে দেন, স্যার—'

সুযোগটা অনিমেষই পেল।

একটা নিদারুণ চাপা উল্লাসে ওর হৃদ্‌পিণ্ডটা কয়েকবার দুলে উঠলো বুঝি প্রবলবেগে। চাকরী এবং সেইসঙ্গে মনের গোপন বাসনাটা পূর্ণ করে নেবার সুযোগ পেল সে এতদিনে।

একটা বড় চড়াই অতিক্রম করে এসে অনিমেষ জীপ থামায়। বনজঙ্গল-পাহাড় কেটে এই পাকদণ্ডী পথ তৈরী হয়েছে যুদ্ধের সময়ে। আগে ছিল না।

অনিমেষকে অনুসরণ করে আর একখানা জীপ এগিয়ে আসছে। তাতে আছে ইঞ্জিনিয়ার আর তার অপর এক সহকারী। তাদের অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে অনিমেষ।

তারপর দ্বিতীয় জীপটি একসময় অনিমেষের কাছে দ্রুত এগিয়ে এসে যেভাবে গর্জন করে উঠলো, তার চেয়ে বিশ্রীভাবে যেন ফুঁসে উঠলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

'আপনার হয়তো প্রাণের মায়া নেই। কিন্তু আমাদের আছে। এত জোরে এ রাস্তায় জীপ চালানো স্রেফ গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? আপনি কি আমাদের পথ দেখিয়ে আনছেন, নাকি ছুটে পালিয়ে যেতে চাইছেন—সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'আই অ্যাম সরি, স্যার।' চোখেমুখে একটা করুণ অনুতাপের ভাব প্রকাশ-করে অনিমেষ বললে, 'পুরোনো দিনের স্মৃতি আমাকে একটু চঞ্চল করে তুলেছিল। তাছাড়া আমার বোধ হয় জ্বর আসছে।'

তারপর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর ফুটিয়ে আবার সে বললে, 'আমাকে সাবধান করে দিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। আর ভুল হবে না।'

ইঞ্জিনিয়ার মাথা নেড়ে অনিমেষের ত্রুটি-স্বীকার মেনে নিলে।

অনিমেষ মনে মনে বললেঃ চিন্দুইন পর্যন্ত এগিয়ে যাই আগে। তারপর তোমরা জাহান্নমে যাও, আমি দেখতে আসবো না। আমি চিনতে পারছি। এর পর থেকে প্রতিটি পদক্ষেপই আমাকে নিজের স্বার্থেই লক্ষ্য করে এগোতে হবে।

রাত্রে তাঁবু পড়লো এক স্থানে।

মশারীর ভেতরে শুয়ে আছে অনিমেষ। অন্ধকারে বাইরে তাকিয়ে আছে। আকাশে আসন্ন বর্ষার মেঘ এখানে ওখানে নক্ষত্রপুঞ্জকে গ্রাস করে ঘনীভূত হচ্ছে।

অনিমেষ বিছানায় পা হাত ছড়িয়ে বেশ আরাম করে শুলো। রাতের জঙ্গলের আওয়াজ শুনছে কান পেতে। ইঞ্জিনিয়ার এবং তার অপর সাহায্যকারীর নাসিকাধ্বনি কানে আসছে অন্য দুটি মশারীর ভেতর থেকে। তাঁবুর ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

অনিমেষের চোখ ঘুম নেই। পুরনো কথার স্মৃতিতে মন তোলপাড়।

......একটা পুরোনো, প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া ট্রাকে সেদিন ছিল তিনজন আরোহী। গতির চেয়ে ট্রাকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছিল বেশী। তবু, সেই ভয়ঙ্কর দিনের জরুরী প্রয়োজনে ট্রাকটার ভূমিকা ওদের কাছে আদৌ কম ছিল না। নিরাপদ দূরত্বে ওরা তখন পালিয়ে যেতে চাইছে। সুতরাং ট্রাকটার গতি যতই কম হোক, পায়ে হাঁটার চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশী। যদিও তার অবস্থা ছিল যৎপরোনাস্তি জরাজীর্ণ।

এমন অবস্থাতেও গাড়িটা ওদের সঙ্গে বিশ্বাস-

ঘাতকতা করেনি। শেষপর্যন্ত একটা মরুভূমিসদৃশ অঞ্চলের মধ্যে গিয়ে সেটার তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল, এই যা। পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হলো গাড়িটা। আরোহী তিনজন অতঃপর পায়েহাঁটা শুরু করে দিল। যে কোন-ভাবে হোক, শুষ্ক অঞ্চলটা ওদের অতিক্রম করতেই হবে।

তিন আরোহী—অনিমেষ, বিভূতি আর মুকুন্দ।

ওদের তিনজনের মধ্যে রোগা ছিল বিভূতি। বয়সেও ছিল অনিমেষ ও মুকুন্দর চেয়ে দু'চার বছরের ছোট। হাল্কা পাখীর মতো শরীর। তাই বিভূতিকে নিয়ে ছিল তাদের দুর্ভাবনা। দুর্গম পথের শ্রম তো ছিলই, তার ওপর নিজেদের প্রয়োজনীয় কিছু আহার্য-পানীয় নিজের নিজের পিঠে ঘাড়ে চাপিয়ে নিতে হয়েছে।

তা ছাড়াও অনিমেষ লক্ষ্য করছে, বাড়তি একটা চামড়ার ব্যাগ মুকুন্দ বিভূতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। আর বিভূতিও সেই রোগা দুর্বল শরীরে ভারবাহী একটা নিরীহ জন্তুর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে সেই বাড়তি বোঝাটা বয়ে নিয়ে চলেছে বিনা প্রতিবাদে।

কিন্তু কেন? ব্যাগটা কেন ওরা অনিমেষকে দিচ্ছে না? তার দৃঢ় ধারণা হয়, মুকুন্দ আর বিভূতি তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু কেন এই অবিশ্বাস? কি আছে ওই চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে? সে কান খাড়া করে থাকে, এবং ওদের টুকরো টুকরো কথার সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে, পায়রার ডিমের আকারের অনেকগুলো রক্তমণি পাথর আছে ব্যাগের ভেতরে। মাইনিং করপোরেশন থেকে পালিয়ে আসবার সময়ে কোন্ ফাঁকে মণিগুলোকে ওরা দুজনে সরিয়েছে, অনিমেষ বুঝতে পারেনি।

বিভূতির কষ্ট হচ্ছে। তবু কেন মুকুন্দ ভারী ব্যাগটা বিভূতির ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছে? বিভূতিই বা কেন একা ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে?

মূল কারণ অনুমান করতে কষ্ট হয় না অনিমেষের। ব্যাগটার ওপর যদি ওর লোভের দৃষ্টি পড়ে, তাহলে মুকুন্দ হয়তো দৈহিক শক্তিতে ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু মুকুন্দর কাছে যদি ব্যাগটা থাকে, তাহলে বিভূতির পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়। কাজেই ওর কাছে ছিল ব্যাগটা আর সজাগ সতর্ক প্রহরীর মতো মুকুন্দ বিভূতিকে এবং মূল্যবান রক্তমণির ব্যাগটাকে আগলে নিয়ে যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে।

কিন্তু তবু কি শেষরক্ষা হলো? হয়নি।

একদিন সন্ধ্যের সময়ে পথে হঠাৎ কম্প দিয়ে প্রবল জ্বর এল মুকুন্দর। জ্বরের ঘোরে ও ভুল বকতে শুরু করে দিলে। নিজেদের কাছে খাবার জন্যে তখনো যে-টুকু জল অবশিষ্ট ছিল, তার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গেল মুকুন্দর মাথায় ঢালতে ঢালতে। ঘন-ঘন মুখেও দিতে হয়।

ওদিকে বিভূতিও যেন চলার শক্তি হারিয়ে ফেলছে একটু একটু করে। তার পা-দুটো ফুলে উঠেছে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। একটা উদ্বেগ এবং নিরতিশয় আতঙ্কে বিভূতির মুখটা যে কালিলেপা হয়ে গেছে, অনিমেষ সেটা লক্ষ্য না করে পারেনি।

কাছেই ছিল একটা প্যাগোডা। পাশে বড় পাত-কুয়া। কিন্তু জল আছে তো পাতকুয়ার ভেতরে? রাত্রিটা কাটুক। সকালে চেষ্টা করে দেখা যাবে। প্যাগো-ডার ভেতরেই রাতটুকুর মতো আশ্রয় নিয়েছে ওরা তিনজনে।

অনিমেষের চোখে ঘুম নেই।

মাঝে মাঝে মুকুন্দ জ্বরের প্রকোপে অন্ধকারের মধ্যে ভুল বকছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে।

বিভূতির কাছ থেকে কোন রকম সাড়া নেই। অনিমেষ ভাবলে, বিভূতি নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারপর—অনেকক্ষণ পরে অন্ধকারের মধ্যে একটা দৃশ্য দেখলে অনিমেষ। পাখীর মতো হাল্কা শরীর নিয়ে পা টিপে টিপে একটি মূর্তি প্যাগোডার পাশে পাতকুয়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কী একটা জিনিস যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল তার ভেতরে। অতঃপর আবার প্যাগোডার ভেতরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লো চুপচাপ।

সেই ব্যাগটা—যার ভেতরে রয়েছে পায়রার ডিমের আকারের অনেকগুলো মূল্যবান রক্তমণি! মুকুন্দর অবস্থা সঙ্গীন। নিজের ওপরেও আস্থা নেই। লোভী বিভূতি তাই সতর্ক হয়েছে! অনিমেষকে সে তিলমাত্রও বিশ্বাস করে না।

এমন সময়ে আকাশে প্লেনের গর্জন শোনা গেল। যে কোন মুহূর্তে শত্রুপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে যেতে পারে! নেমে আসতে পারে সশস্ত্র প্যারাস্যুট বাহিনী!

স্প্রিং-দেওয়া কলের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় অনিমেষ।

'বিভূতি—বিভূতি! শুনতে পাচ্ছিস—?'

বিভূতি পাগলের মতো মুকুন্দর জ্বরে বিকারগ্রস্ত দেহটাকে দুহাত দিয়ে জাপটে ধরে ভেউ ভেউ করে

কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'না, না! মুকুন্দদাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কেমন করে পালাবো? বোমার ঘায়ে মরতে হয়, আমরা দুজনে একসঙ্গেই মরবো! আমি মুকুন্দদাকে ছেড়ে যাব না!'

অনিমেষ আর তিলমাত্র বিলম্ব করেনি। সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়েছিল একাই। ওভাবে অনিমেষ মরতে চায়নি বলেই তো এত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। আরো কত দিন লাগবে একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে, ওর জানা নেই। তাই সেই অজানা অনাগত দিনগুলোর কথা ভেবে মুকুন্দ আর বিভূতির ভাগের আহার্য-পানীয় যা অবশিষ্ট ছিল, সব ছিনিয়ে নিয়েই অন্ধকারের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে-দিন।......

মুকুন্দ কি সুস্থ হয়ে উঠেছিল তারপর? বিভূতি কি প্রাণ নিয়ে সশরীরে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠতে পেরেছিল শেষে? না, নিশ্চয়ই তা সম্ভব হয় নি। অনেকবার একথা ভেবেছে অনিমেষ। ওর মন সায় দেয়নি। বিভূতির প্রাণটা তার গলার কাছে এসে ঠেকেছিল অনেক আগেই। তার ওপর খাবার নেই, তেষ্টার জল নেই—জনশূন্য মরুভূমিপ্রায় একটা শুষ্ক অঞ্চল। কানের পাশে জাপানী বোমা ফাটছে! কাজেই বিভূতির প্রাণটা নির্ঘাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল।

অতএব সেই রক্তমণিগুলো প্যাগোডার পাতকুয়ার মধ্যে এখনো পড়ে রয়েছে। থাকাই সম্ভব।

সেখানে ফিরে যাবার জন্যে অনিমেষ চেষ্টা করেছে বার বার। কিন্তু বার্মা সরকার ওদিকটায় সাধারণের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে, সেদিকে কড়া সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। যুদ্ধ অবসানের পর থেকেই নাকি এই ব্যবস্থা। একবার তো লুকিয়ে কিছুদূর গিয়েছিলও অনিমেষ। কিন্তু কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ভ্রাম্যমান প্রহরীদের রাইফেলের গুলি তার প্রায় কানের পাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন।

তারপর থেকে অনিমেষ কেবলই সুযোগ খুঁজছে। আর জরীপ-বিভাগ সেই সুযোগই এতদিন পরে অনি-মেষের হাতে তুলে দিলে। অনিমেষ এবার সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। ঈশ্বর সহায়! ও পৌঁছবেই সেই প্যাগোডার কাছে।

কাজের ছক ও মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। আর কিছুদূর এগোলেই সোজা চিন্দুইনের পথ ধরতে পারবে ওরা। অনিমেষ জায়গাটাকে চিনতে পেরেছে। চিন্দুইনের পথ ধরবার সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের গাড়ির ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারকে সে বলবে, ওরা ততক্ষণ চিন্দুইনে গিয়ে বিশ্রাম নিক। ইঞ্জিনটাকে মেরামত করে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে গিয়ে সেখানে ওদের সঙ্গে মিলবে।

অপর সাহায্যকারীকে নিয়ে তারপর চলে যাবে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। অনিমেষ তখন ওর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সেই প্যাগোডার পাশে পাতকুয়ার কাছে পৌঁছে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। ওকে দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। তারপর—পাতকুয়ার ভেতর থেকে পায়রার ডিমের আকারের মূল্যবান মণিগুলোকে উদ্ধার করে নেওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে চিন্দুইনের পথে ছুটে চলবে ওর জীপ। জীপটাকে ইঞ্জিনিয়ারের হাতে জমা দিয়েই এ চাকরীতে ইস্তাফা দেবে অনিমেষ!

মশারীর ভেতরে একটা বড় আকারের মশা ঢুকে পড়েছে। অনিমেষের অন্যমনস্কতার সুযোগে ওর কপালে বসে রুধির পান করছে মনের আনন্দে। ভাবনাটা শেষ হওয়ার পরেই অনিমেষ কপালের ওপরে একটা কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা অনুভব করলো। সঙ্গে সঙ্গে চটাং করে সেই জায়গায় একটা চড় মেরে হাতটাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো সে। ইস্! মশাটা অনেকটা রক্ত চুষে নিয়েছে। হাতের তালু রক্তে মাখামাখি!

চিন্দুইনের পথ ধরতে আরো তিনটে দিন ওদের লাগলো। যে পথ দিয়ে ওরা চলেছে, তারই একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে ক্ষণিকের উত্তেজনায় অনিমেষের হৃদ্‌পিন্ডটা বারেকের জন্যে যেন লাফিয়ে উঠলো। ওই বাঁকের কাছ থেকে কিছুটা পূর্বদিকে ছোট্ট একটা গ্রাম। জাপানী বোমার ভয়ে গ্রামবাসীরা তখন সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরেই রুক্ষ মরুভূমির মতো অঞ্চলে একটা প্যাগোডা। পাশে পাতকুয়া। তার ভেতরে—!

সেই বাঁকের মুখে একটা পিপুল গাছের তলায় মুণ্ডিত মস্তক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ওরা বসে থাকতে দেখলে।

ইঞ্জিনিয়ার গাড়ী থামায় সন্ন্যাসীর একটা ফটো তুলবার জন্যে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সন্ন্যাসী তার হলুদ পোশাকে মুখ লুকিয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি। কেউ তার ফটো তুলুক—সন্ন্যাসী তা চায় না। তারপর পথে আর কোন মানুষ-জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ওদের ঘটেনি।

তারপর অনিমেষের ছক মতো ইঞ্জিনিয়ার তার অপর

সাহায্যকারীকে নিয়ে চিন্দুইনের পথে এগিয়ে গেছে। খারাপ হয়ে গেছে অনিমেষের গাড়ি। অনিমেষ তাদের বলে দিয়েছে, গাড়ির ইঞ্জিনের ত্রুটি খুব মারাত্মক নয়। সেটা নিজেই সে মেরামত করে নিতে পারবে। ওরা চিন্দুইনে পৌঁছে অনিমেষের জন্যে যেন অপেক্ষা করে।

অতঃপর এই সুযোগে অনিমেষ পৌঁছে গেল প্যাগোডায়। ঠিক তেমনি সব রয়েছে। এখান-ওখান থেকে সাদা প্লাস্টার খসে পড়েছে কিছু কিছু। ভেতরের বুদ্ধমূর্তির কোন রকম পরিবর্তনই হয়নি মনে হচ্ছে।

একটা বাঁশবনের আড়ালে জীপটাকে রেখে এল অনিমেষ। তার অবশ্যি প্রয়োজন ছিল না—অনিমেষকে এদিকে আসতে কেউ দেখেনি। আর যাই হোক, কোন মানুষ পায়ে হেঁটে এমন পাহাড়জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম অঞ্চলে হাওয়া খেতে আসবে না।

গাড়ির ভেতর থেকে অনিমেষ একটা মোটা দড়ি আর একটা টর্চ বের করে নিয়ে এসেছে। হৃদ্‌পিন্ডটা ধক্‌ধক্‌ করছে। ঘামে ভিজে উঠছে গোটা শরীর। ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানছে ও। কেমন যেন একটা কষ্ট বোধ হচ্ছে শরীরের মধ্যে।

প্যাগোডার ভেতরে ধুলো আর গাছের ঝরাপাতা কার্পেটের মতো বিছানো। অনিমেষের পায়ের তলায় মড় মড় করে শব্দ উঠছে। প্যাগোডার অপর পার্শ্বে রয়েছে সেই পাতকুয়া। দ্রুত সে পাতকুয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে। ভেতরে ফেললে টর্চের আলো। আলোকরশ্মি তলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো কিনা সে বুঝতে পারে না। একটা পাথরের টুকরো সে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শব্দ শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। নীচের দিক থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ এল। জলে পাথর পড়ার শব্দ ওটা নয়। পাতকুয়ার জল নেই তাহলে। মনে পড়ে, সেদিনও ছিল না।

প্যাগোডার ছুঁচোলো একটা কার্নিশের সঙ্গে দড়ির একটা প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্তটা অনিমেষ পাতকুয়ার ভেতরে নামিয়ে দিলে। এক সময়ে সেটা একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে বলে মনে হয় ওর। এবার সেই দড়ি শক্ত করে চেপে ধরে পাতকুয়ার ভেতরে ও নামতে শুরু করে। ভেতর দিকের দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে দড়ি ধরে সে অনেকটা নীচে নামলে। কিন্তু তারপরেই একেবারে নীচের দিকের দেওয়াল এত মসৃণ যে সেখানে ও কিছুতেই পা রাখার জায়গা পায় না। এই যখন অবস্থা, তখন দড়ির ওপর থেকে হঠাৎ ওর হাতের মুঠি গেল আলগা হয়ে। হুস করে সে পাতকুয়ার একেবারে তলায় গিয়ে পড়লো। ওর পায়ের নীচে শুধু নরম বালি আর গাছের শুকনো ঝরাপাতার স্পর্শ।

অনিমেষ টর্চ জ্বালালে। বুকের ভেতরে হৃদ্‌পিন্ডের শব্দটা যেন কানে এসে বাজছে। কই? কোথায়? পাতার স্তূপ সরিয়ে বালির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেয় অনিমেষ। পাগলের মতো হাতড়াতে থাকে। হাতের মুঠোর মধ্যে গাছের পাতা উঠে আসছে। পাথর নুড়ি বালি আসছে। হাতে ঠেকছে গাছের মরা শুকনো ডাল। কিন্তু সেই ব্যাগটা কোথায়—যার মধ্যে রয়েছে পায়রার ডিমের আকারের মূল্যবান অনেকগুলো রক্তমণি? ...এই! এই তো! ব্যাগটা অনিমেষের হাতে উঠে এল। এই যে! আনন্দে অনিমেষের যেন চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়। মণিগুলোর ওপরে টর্চের আলো ফেলে সেদিক থেকে ও যেন আর দৃষ্টি ফেরাতে পারে না!

এক সময়ে সে বালির ওপর বসে পড়ে। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটারের আগুনে ধরিয়ে নেয়। এবং লম্বা করে কয়েক টান দিয়ে পোড়া সিগারেটটাকে দেওয়ালে ঘষে আগুন নিভিয়ে ফেলে। এবার ওপরে উঠতে হবে।

ব্যাগটাকে কোমরে গুঁজে নিয়ে দড়িটাকে ও দুহাত দিয়ে চেপে ধরলো আবার। উঠতে থাকে ওপর দিকে। চারপাশের দেওয়াল খুবই মসৃণ। পা রাখা যাচ্ছে না। কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে—কোন দিকেই পায়ে টিপ দিয়ে ওপর দিকে ওঠা যাচ্ছে না ভালভাবে। ফলে ওপর দিকে ওঠার চেয়ে দড়ি ধরে অনিমেষকে দোল খেতে হচ্ছে বেশী রকম।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। তারপর—অনিমেষ প্রথমে বুঝতে পারেনি, ও আবার নীচের দিকে নেমে আসছে। নীচে ধপাস করে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মালুম হলো। দড়িটাও সর্‌ সর্‌ করে এসে পড়লো ওর দেহের ওপরে। কী সর্বনাশ!

অনিমেষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল আর্ত চীৎকার। ও ওপর দিকে তাকালো। অনেক উঁচুতে দেখা যাচ্ছে পাতকুয়ার মুখ। বাইরের পৃথিবীতে চাঁদ উঠেছে। একটা গোল সাদা থালার মতো মনে হচ্ছে পাতকুয়ার মুখটাকে।

কিন্তু ও কী! অনিমেষ চমকে উঠলো। কে ওখানে?

সেই থালার ওপরে একটা মানুষের কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত ছায়া পড়েছে!

নিদারুণ আতঙ্কে, করুণ আকুতি জানিয়ে চীৎকার করে উঠলো অনিমেষ, 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও!'

গম্ গম্ করে উঠলো পাতকুয়ার অভ্যন্তর!

অনিমেষের আতঙ্কিত দৃষ্টি একটু একটু করে চিনতে পারছে ওপরের ছায়াটাকে। মুণ্ডিত মস্তক! কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কি? পথের মাঝে দেখা সেই সন্ন্যাসীটি নয়তো?

'এই যে—আমি এখানে পড়ে গেছি! বাঁচান! বাঁচান আমাকে।' বর্মীভাষায় চীৎকার করে বললো অনিমেষ। কণ্ঠ যেন ওর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল।

উত্তর এল ওপর থেকে, 'সময় পূর্ণ হলে তুমি যে আবার এখানে ফিরে আসবে, এ আমি জানতাম, অনিমেষ।'

কে? কার কণ্ঠস্বর? মুকুন্দ? অনিমেষ চীৎকার করতে গেল। কিন্তু দেখলো, কথা বলার শক্তি যেন ও হারিয়ে ফেলেছে এই মুহূর্তে।

'রক্তমণিগুলো প্রথমে চুরি করে এনেছিলাম আমি। আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলাম। পরে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আমি ভগবান তথাগতের কাছে করুণা ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি, অনিমেষ। আমার এটা ছদ্মবেশ নয়। আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

'মুকুন্দ!' সর্বশরীর শিউরে উঠলো অনিমেষের। অসহায়ভাবে বললো, 'মুকুন্দ! আমি এখানে ফিরে এসেছি—তোমাদের জন্যে। যদি তোমাদের কোন সন্ধান পাই, এই ভেবে। আমি চুপচাপ বসেছিলাম না, মুকুন্দ। এই কটা বছর ধরে...'

'আমি বিশ্বাস করছি।' মুকুন্দ বললো, 'কর্মের হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই। যাই হোক, এত দিনে শান্তিলাভ করার সুযোগ তোমার এসেছে।'

'মুকুন্দ! এ কাজ তুমি করতে পার না। না! আমাকে এভাবে এখানে ফেলে রেখে তুমি চলে যেতে পার না, মুকুন্দ। তোমার পক্ষে এটা নৃশংস কাজ হবে। এটা হত্যার সামিল!'

'তোমার এ অবস্থার জন্যে আমি দায়ী নই। তোমার লোভ তোমাকে এ পথে ঠেলে দিয়েছে। তুমি একটা পুরোনো অ-মজবুত কার্নিশের সঙ্গে তোমার দড়িটা বেঁধে রেখে গিয়েছিলে। যেখানে তোমার জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে তুমি এমন কাজ কেন করতে গেলে? ইঙ্গিতটা তুমি এখনও বুঝতে পারছো না?'

'মুকুন্দ! আমার কথা শোন, মুকুন্দ। তোমার মনে এখন যে কথাটা জাগছে, তা বোধহয় আমি বুঝতে পারছি। বিশ্বাস করো, আমি সেদিন খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। জলের জন্যে ছোটাছুটি করছিলাম। আমাদের তিনজনের জন্যেই সে সবের দরকার ছিল, মুকুন্দ। তারপর আমি আর ফিরে আসতে পারিনি। অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অন্য লোক আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। আগেকার স্মৃতি কিছুদিনের জন্যে আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল—'

মুকুন্দ কি ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না?

না না, ঐ যে মুকুন্দ কথা বলছে।

স্বপ্নের ঘোরে যেন কথা বলতে লাগলো মুকুন্দ, 'বিভূতিও তো আমার অসুস্থ শরীরটাকে ফেলে রেখে সেদিন পালিয়ে যেতে পারতো। তার নিঃস্বার্থ সেবা-যত্ন দিয়ে সে বাঁচিয়ে তুললো আমাকে। কিন্তু বেচারা নিজেকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলো না। আমাদের তিনজনের জন্যে যেটুকু জল, খাবার ছিল, তুমি তোমার নিজের জন্যে সে সবটুকুই সেদিন নিয়ে গিয়েছিলে। বিভূতির মুখে তার মৃত্যুর সময়ে আমি একফোঁটা জল দিতে পারিনি। সে যে কী কষ্ট! অনিমেষ, এই কুয়োর ভেতরে ঢোকবার সময়ে একবারের জন্যেও কি তোমার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল? নাকি কটা পাথরের টুকরোর লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে তুমি?'

'আমি তোমার রক্তমণি চাই না, চাই না!'

'রক্তমণিগুলো আমারও না, তোমারও না।' মুকুন্দ উত্তর দিলে, 'যে মাটি ওগুলোর জন্ম দিয়েছে, সেখানেই ফিরে গেছে ওগুলো। ওখানে থাকলে ওগুলো আমাদের কারো কোন ক্ষতি করবে না।'

'বেশ, রক্তমণিগুলো এখানেই থাকুক।' অনিমেষ বললো, 'এবার আমাকে এখান থেকে উঠে যেতে তুমি সাহায্য করো, মুকুন্দ।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না, বাধাও দিতে পারি না, অনিমেষ! ওটা তোমার কর্মের ফল—যেমন আমার এটা...'

অনিমেষ নীচে থেকে লক্ষ্য করলো, মুকুন্দ ওর দুটো হাত পাতকুয়ার মুখের কাছে তুলে ধরে নাড়ছে! কিন্তু ও কী! জ্যোৎস্নার স্বল্প আলোতেও অনিমেষের দেখতে ভুল হয় না—মুকুন্দর দুহাতে একটাও আঙুল নেই!

'কুষ্ঠ! অনিমেষ, কুষ্ঠব্যাধিতে হাতের আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এটা আমার ভগবানের আশীর্বাদ! আঙুলগুলো থাকলে ওই রক্তমণিগুলোকে দখল করার জন্যে আমিও হয়তো লোভে অন্ধ হতাম। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। ভগবান তথাগতের পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমি বড়ই শান্তিতে আছি।'

'তুমি আমাকে এখানে এইভাবেই রেখে দিতে চাও? মুকুন্দ, এ কাজ নরহত্যার সমান। তুমি বলছো, বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছ তুমি। অহিংসা তোমার ধর্মের কথা। তুমি খুন করতে পার না। আর একটা দড়ি নিয়ে এস, মুকুন্দ। ওপর থেকে সেটা তুমি নামিয়ে দাও—আমাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করো......'

প্রার্থনা জানানোর ভঙ্গীতে প্রায় ফিসফিস করে শেষ কথাগুলো বললো অনিমেষ।

'আমি তোমাকে খুন করবো না।' মুকুন্দ শান্ত গলায় বললো, 'তোমার অনুরোধ রাখতে আমি অস্বীকারও করছি না। তোমার নিজের ইচ্ছায় তুমি কাজ করবে। শোন, আমি যদি আর একটা দড়ি সংগ্রহও করে আনি, তাহলেও আমার এই হাত দিয়ে সেটার একটা দিক শক্ত করে কোথাও বাঁধতে পারবো না। সুতরাং আমি গ্রামের দিকে যাচ্ছি। গ্রামবাসীদের সাহায্য তুমি পেতে পারবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাকে শূন্য হাতে ওখান থেকে উঠে আসতে হবে। এতে যদি রাজী হও, তাহলে আমি গ্রামবাসীদের ডেকে আনতে পারি। আর তা না হলে—দ্বিতীয় আর একটা পথের কথা বলি।'

'বলো! দ্বিতীয় পথটা কি?'

'তুমি যেখানে আছ, সেখানেই থাক। আমি তোমায় প্রতিদিনের প্রয়োজনমতো জল আহার দিয়ে যাব।'

আতঙ্কে শিউরে উঠে অনিমেষ চীৎকার করে বললো, 'শোন, আমার কথা শোন, মুকুন্দ। এখানে পড়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস! তুমি একটু বিবেচক হও। কুষ্ঠব্যাধি আজকালকার দিনে দুরারোগ্য নয়। তোমার অসুখ সেরে যাবে। টাকার অভাব হবে না। এখানে অনেক আছে। আমাদের দু'জনের পক্ষে কম হবে না। তুমি আর একটা দড়ি সংগ্রহ করে আন। একটু বড় দেখে নেবে। প্যাগোডার ভেতরে যে বুদ্ধ-মূর্তি রয়েছে, তাকে বেড় দিয়ে ঘিরে দড়ির দুটো প্রান্তই আমার কাছে ছুঁড়ে দেবে। তাতে বাঁধার কাজের ঝামেলা নেই। মূর্তিটা অনেক বড়, ভারী এবং মজবুতও। আগে আমাকে ওপরে তোলার ব্যবস্থা করো। তারপর তোমার সঙ্গে আমি আরো কথা বলবো তখন যদি আমার কথা তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে মুখ বুজে এখান থেকে চলে যাব আমি। আর এখানে ফিরে আসবো না। আমি কথা দিচ্ছি—'

'তুমি ওপরে উঠে এসে আমাকে একলা পেয়ে হত্যা করবে, অনিমেষ।' মুকুন্দ বললো, 'তুমি জানো, এটাই তোমার মনের কথা। তোমার লোভ তোমাকে ও কাজ করতে বাধ্য করবে। আমি তখন তোমাকে বাধা দিতে সক্ষম হবো না। অবশ্যি তেমন হলে, চেষ্টাও করবো না। আমি যাচ্ছি। একজন মানুষ নিজেকে নিজে ধ্বংস করে ফেলছে, এ দৃশ্য আর একজন মানুষ পাশে দাঁড়িয়ে নির্বিকার ভাবে দেখতে পারে না!'

'মুকুন্দ...!!' অনিমেষ চীৎকার করে কেঁদে উঠলো!

দূরের এক গ্রাম থেকে কিছু মানুষ এক সময়ে সেখানে এসে পৌঁছলো। অনেক চেষ্টা করে যখন অনিমেষকে তারা সেই পাতকুয়ার ভেতর থেকে উদ্ধার করলো, তখন অনিমেষের ইঞ্জিনিয়ারও ওকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে পড়েছে। কিছু বুঝতে না পেরে স্তব্ধ বিস্ময়ে ইঞ্জিনিয়ার তাকিয়ে রইলো ওর দিকে! দেখলো, অনিমেষ কোন্ এক রহস্যজনক কারণে ঘোর উন্মাদ হয়ে গেছে!

টুকরো হাসি—একটু হাসো!

—রাম চট্টখুণ্ডী

মা—হ্যাঁরে খোকা, সামনে পরীক্ষা, তার জন্যে কোথা তৈরী হবি—তা নয়, চেয়ার-টেবিলগুলোকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে লাগলি কেন?

খোকা—পরীক্ষার জন্যেই তো তৈরী হচ্ছি মা! এগুলোই তো আজকাল পরীক্ষায় কাজে লাগে।

দীপালি হালদার

বর্তমান সংখ্যা থেকে শুরু হলো আর একটি বিভাগ—ইতিহাসের দিনলিপি। কাল বা সময় নিরবধি। তার স্রোত চলেছে। দুরন্ত বেগ তার, দুর্বার তার গতি—না আছে শুরু না আছে শেষ। আদি-অন্তহীন এই মহাকালের বুকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। স্মরণাতীত কাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে এই যে ঘটনার স্রোত, তার এক সামান্য অংশই জানতে পেরেছে মানুষ। যেটুকু জেনেছে, সেইটুকুই ইতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাসের পরিমাণও কম নয়। তার মধ্যে যেসব ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়, প্রতি মাসে সংক্ষেপে তাদের কথা বলা হবে ইতিহাসের দিনলিপিতে। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য এক মাসের সব ঘটনা সেই মাসের কিশোর ভারতীতে একবারে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বছরের পর বছর প্রতি মাসে চলবে ইতিহাসের দিনলিপি, শোনান হবে ইতিহাসের চমকপ্রদ কাহিনী—অবশ্য যদি তোমরা শুনতে চাও।—সম্পাদক

১লা নভেম্বর

সমুদ্রের তীরে বিশাল বন্দর লিসবন। ১৭৫৫ সালের পয়লা নভেম্বর। রবিবার। অল সেন্টস্ ডে। সকাল থেকে সবাই হাসি-খুশী। পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী, বাচ্চা-কাচ্চা হাত ধরাধরি করে চলেছে গীর্জার দিকে। সকাল ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিট। হঠাৎ সমস্ত বন্দর প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। কে যেন প্রচণ্ড আক্রোশে বন্দরের ভিত্ ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আর্ত চিৎকার উঠল—ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! সে কম্পন বা ঝাঁকানি চলল ছ' মিনিট ধরে। হুড়মুড় করে বাড়ী-ঘর ভেঙে পড়তে লাগল। গীর্জা ভেঙে পড়ল প্রার্থনা-রত নর-নারী, বাচ্চা-কাচ্চার মাথায়। কম্পনে সমুদ্রের বুকেও তুমুল আলোড়ন জাগে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জল চল্লিশ ফুট উঁচু হয়ে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করল। পায়ের তলার মাটিও ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা। সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলল ছ'দিন ধরে। এই ভূমিকম্পে লিসবন বন্দর প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বারো হাজার বাড়ী-গীর্জা-প্রাসাদ ভেঙে পড়েছিল। প্রাণ হারিয়েছিল ষাট হাজার নর-নারী।

৩রা নভেম্বর

নদীতে জাল বাইতে বাইতে জেলে গান গায়, গরুর গাড়ীর ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে গাড়োয়ানের মিঠে কন্ঠস্বর মিশে যায়, হাটতলায় কিংবা বারোয়ারী তলায় রামায়ণ কিংবা জারি গানের আসর বসে। এসবই বাঙলার মাটির গান—মাটির কথা। আর এর উৎস হচ্ছে হাজার হাজার হাতে-লেখা পুঁথি, ওগুলো ছড়িয়ে আছে গ্রামে-গ্রামে। ওগুলোর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণ-পুতলি। এই বঙ্গ-সংস্কৃতি ও বঙ্গদেশকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলেন এক যুবক। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অসীম পরিশ্রমে এইসব নমুনা সংগ্রহ করতে শুরু করেন তিনি। তাঁর নাম দীনেশচন্দ্র সেন। বঙ্গ-সংস্কৃতির ইতিহাসকার হিসাবে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাই স্মরণীয়। ঢাকা জেলার বাগজুড়ী গ্রামে ১৮৬৬ সালের তেসরা নভেম্বর দীনেশচন্দ্র সেনের জন্ম। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এবং তিনি অজস্র প্রশংসা পান। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' ১ম ও ২য় খণ্ড মূল্যবান গ্রন্থ। এ ছাড়া আরও বহু মূল্যবান বই তিনি লিখে গেছেন। ১৯৩৯ সালের

বিশে নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

৫ই নভেম্বর

কে সেই অদ্ভুত ত্যাগী মানুষটি—যিনি রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, নিজেও কর্মক্ষেত্রে ছিলেন সফল ও কৃতী পুরুষ, মাসে অনায়াসে পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করতেন, কিন্তু যখন পরাধীন মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের ডাক এল তখন সব কিছু ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন? তিনি ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশের জন্য সর্বস্ব দান করেছিলেন, তাই দেশবাসী তাঁর নাম রেখেছিল দেশবন্ধু। ১৮৭০ সালের পাঁচই নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৯০ সালে বি. এ. পাশ করে তিনি বিলেত যান পড়াশুনা করতে এবং ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। মানিকতলা বোমার মামলা পরিচালনা করে তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে জননেতা হন। কারাদণ্ডও ভোগ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য পরবর্তী কালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯২৪ সালের ১৬ই জুন তিনি দার্জিলিঙে পরলোক গমন করেন।

৭ই নভেম্বর

বিশ্ব ইতিহাসে এক দিনটি সোনার আখরে লেখা রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ১৯১৭ সালের এই দিন অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা অত্যাচারী জারের পতন ঘটিয়ে জনতার রাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন মহান লেনিন। সীমাহীন শোষণ, অত্যাচার ও দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার আর জারতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের শিকলে বাঁধা ছিল রাশিয়ার কোটি কোটি মানুষ। তার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল রাশিয়া। তাই শোষণের তীব্রতাও বেড়েছিল। এই শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাশিয়ার নিপীড়িত মানুষ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশদিনের সেই সশস্ত্র বিপ্লবের আগুনে জারতন্ত্র ধ্বংস হল। স্বাধীন হল রাশিয়ার জনগণ। মহান লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত হল সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র। সমাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করল পৃথিবীর বুকে।

১০ই নভেম্বর

পরাধীন ভারতে বাঙালী রাজনীতিকদের শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনীর সন্তান—শৈশব থেকেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মানুষ হয়েছিলেন। বিলাতে গিয়েছিলেন আই. সি.এস. হতে। সফল হয়ে ফিরে এসে ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। কিন্তু ইংরাজ ওপরওয়ালার অপমানকর ব্যবহারে চাকরি করতে পারলেন না। দেশের কাজে যোগ দিলেন। ১৮৪৮ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজী পত্রিকা 'বেঙ্গলী'র সম্পাদনা করতেন। তিনি দুবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ১৯২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তিনি মন্ত্রী হন। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয়। ১৯২৫ সালের ৬ই আগস্ট তিনি পরলোকে গমন করেন।

১৩ই নভেম্বর

'কিড্‌ন্যাপ্‌ড্‌' পড়ে নি, এমন কিশোর ইংলণ্ডে বিরল। তেমনি ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইডের কাহিনী শোনে নি এমন শিক্ষিত মানুষও আজকের বিশ্বে নেই বলেই মনে হয়। এই বই দুখানির লেখক হচ্ছেন বরার্ট ল্যুই বালফোর স্টিভেনসন। ১৮৫০ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়। আইনের ছাত্র ছিলেন তিনি। কিন্তু পরে সাহিত্য রচনায় মন দেন। ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও কবি ছিলেন তিনি। তাঁর 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। এই বইয়ের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। আরো অনেক বই তিনি লিখে গেছেন। ১৮৯৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

১৪ই নভেম্বর

বর্তমান স্বাধীন ভারতের রূপকার ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের সুলেখক। জহরলালের জন্ম হয় ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদ শহরে। পিতা মতিলাল নেহরু ছিলেন ধনী আইন-ব্যবসায়ী। ইংলণ্ডে হ্যারো এবং কেম্ব্রিজ শিক্ষায়তনে জওহরলাল পড়াশুনা করেন। পরে আইন পড়ে ব্যারিস্টার হন। ১৯১২ সালে দেশে ফিরে তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন এবং ক্রমশঃ রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বহুবার তিনি ইংরাজের কারাগারে বন্দী হন। কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন অনেকবার। দেশ বিভাগের পর স্বাধীন ভারতের তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন এবং মৃত্যু

পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯শে নভেম্বর

নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ১৮৭৭ সালের ১৯শে নভেম্বর কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ছাত্র-জীবন থেকে তিনি কবিতা লিখতে থাকেন। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার জন্য লেখাপড়া ছেড়ে স্কুলে শিক্ষাকতা শুরু করেন। তারপর বি. এ. পর্যন্ত পড়েন। তাঁর কবিতা-গ্রন্থগুলি হচ্ছে 'বঙ্গমঙ্গল', 'প্রসাদী' 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'রবীন্দ্র-আরতি'। ১৯৫৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

২১শে নভেম্বর

ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ভলতেয়ারের লেখা। তাই ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে ভলতেয়ারের নামও জড়িয়ে রয়েছে। ফরাসী সম্রাটদের দুর্নীতি, তাদের বিলাস-ব্যসন এবং ফরাসী জনগণের অত্যাচারিত জীবনের অপূর্ব ছবি এঁকেছেন ভলতেয়ার। রুগ্ন, কুৎসিৎ-দর্শন, বদরাগী মানুষ ছিলেন ভলতেয়ার, কিন্তু তাঁর লেখনীমুখে আগুন ঝরত। ভলতেয়ার ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসী। শাসক-সরকার তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, তাঁকে বাস্তিল দুর্গে বন্দী করে রেখেছে, সাহিত্য রচনা তবু ছাড়েন নি তিনি। দেশ থেকে বিতাড়িতও হয়েছেন, তবু বিদেশে বসে সম্রাট-শাসিত ফ্রান্সের অবস্থা লিখেছেন। ১৬৯৪ সালের ২১শে নভেম্বর তাঁর জন্ম হয়। ভলতেয়ার তাঁর ছদ্ম-নাম। আসল নাম ফ্রাঙ্কয়েস ম্যারি আরুৎ। তিনি পরলোক গমন করেন প্রায় চুরাশী বছর বয়সে।

২২শে নভেম্বর

আসলে তিনি ছিলেন মহিলা। কিন্তু লিখতে শুরু করেন পুরুষের ছদ্মনামে। কাজেই ইংরাজী সাহিত্যের আসরে তিনি জর্জ এলিঅট নামেই খ্যাত। তাঁর আসল নাম মেরী অ্যান ইভান্স। ১৮১৯ সালের ২২শে নভেম্বর ইভান্সের জন্ম হয়। ইংলণ্ডের গ্রাম জীবনের সঙ্গে তিনি খুব পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর লেখার মধ্যে গ্রামের চাষী-জীবনের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে অ্যাডাম বিড, দি মিল অন দি ফ্লস, সাইলাস মার্নার প্রভৃতি গ্রন্থ বহু-পঠিত। ১৮৮০ সালে জর্জ এলিঅট (মেরী অ্যান ইভান্স) পরলোক গমন করেন।

২৩শে নভেম্বর

সন্তানের জন্ম সংবাদ শুনেও পিতা হুমায়ুন পুরাপুরি আনন্দ উপভোগ করতে পারলেন না। কারণ তখন তিনি শের শাহের কাছে পারাজিত হয়ে সিন্ধু মরুভূমি পার হয়ে ইরানের দিকে প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন। পিছনে ধেয়ে আসছে পাঠান সেনাবাহিনী। এই সময়ে ১৫৪২ সালের ২৩শে নভেম্বর তাঁর পুত্র জালাল-উদ্দীন মহম্মদের বা ইতিহাস-খ্যাত সম্রাট আকবরের জন্ম হয় অমরকোট শহরে। সম্রাট আকবর খুব বুদ্ধিমান এবং রণনিপুণ ছিলেন। ছিলেন সুশাসক এবং রাজনীতিজ্ঞ। ভারতীয় সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। ১৬০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর আগ্রায় তিনি পরলোক গমন করেন।

২৮শে নভেম্বর

আন্টন গ্রিগরভিচ রুবিনস্টেইন ছিলেন রাশিয়ার বিশ্ববিশ্রুত গীতিনাট্যকার ও পিয়ানো-বাদক। ১৮২৯ সালের ২৮শে নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন নামকরা পিয়ানো-বাদিকা। রুবিনস্টেইন মায়ের কাছে পিয়ানো শিখতে শুরু করেন। পরে বার্লিনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম গীতিনাট্য দিমিত্রি ডনস্কয় এবং ফমকা দি ফুল অভিনীত হয়। তিনি রাশিয়ান সঙ্গীত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। রুবিন-স্টেইন অনেকগুলি গীতিনাট্য রচনা করেন। ১৮৯৪ সালে ২০শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০শে নভেম্বর

অন্যান্য জীবের মত উদ্ভিদ বা গাছপালাও বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, এই যুগান্তকারী ঘোষণা করে-ছিলেন বাঙ্গালী-বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বি. এ. পাশ করে তিনি বিলেত যান এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৬ সালে ডকটরেট উপাধি লাভ করে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা শুরু করেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। তিনি জড় ও জীবের সাড়া সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং বাতাস, খাদ্য ও ঔষধের সংস্পর্শে গাছের দেহে যে সাড়া জাগে তা যন্ত্রসাহায্য প্রমাণ করেন। তিনি দেখিয়ে দেন, উদ্ভিদের অনুভূতি ও স্নায়ুজাল প্রাণীদেরই মত। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুধু বিজ্ঞানীই নয়, 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থের লেখক হিসাবেও জগদীশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

পটলচাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান • নারায়ণ দেবনাথ

সব ঠিক আছে। তোমার বাবা এসে দরকারী বাক্সটা নিয়ে স্টেশনে ফিরে গেছেন। তোমার ফিরে আসার দরকার ছিলনা।
কি বলছো তুমি? আমার বাবা তো কবেই মারা গেছেন! আমার অবর্তমানে তোমরা কি করেছো?
গুবলেট করে ফেলেছো পটলদা! আপনার ড্রেসিং টেবিলের ওপরে যে বাক্স ছিল তাতে কি ছিল?
ঘরের ভিতরে
আমার বোনের বিয়ের গয়না ওতে ছিল, ওটা এখান থেকে হাওয়া! তোমরাই ওটা চুরি করতে কাউকে সাহায্য করেছো!
পটলদা, ও লোকটা এক নম্বরের চিটিংবাজ চোট্টা! তোমায় ওকে ধরতেই হবে, নাহলে তুমিও সমান দোষী হবে!
ঠিক বলেছিস! ব্যাটা খুব বেশী দূর যেতে পারেনি। কিন্তু যাদুই খেল লাগাই — হিং টিং ছট, ওঠো চটপট!
এটা কি হচ্ছে পটলাদা?
গেছিরে!
ধরে থাক। ওর চেয়ে বেশী স্পীডের বাহনের দরকার আমাদের বুঝলি?

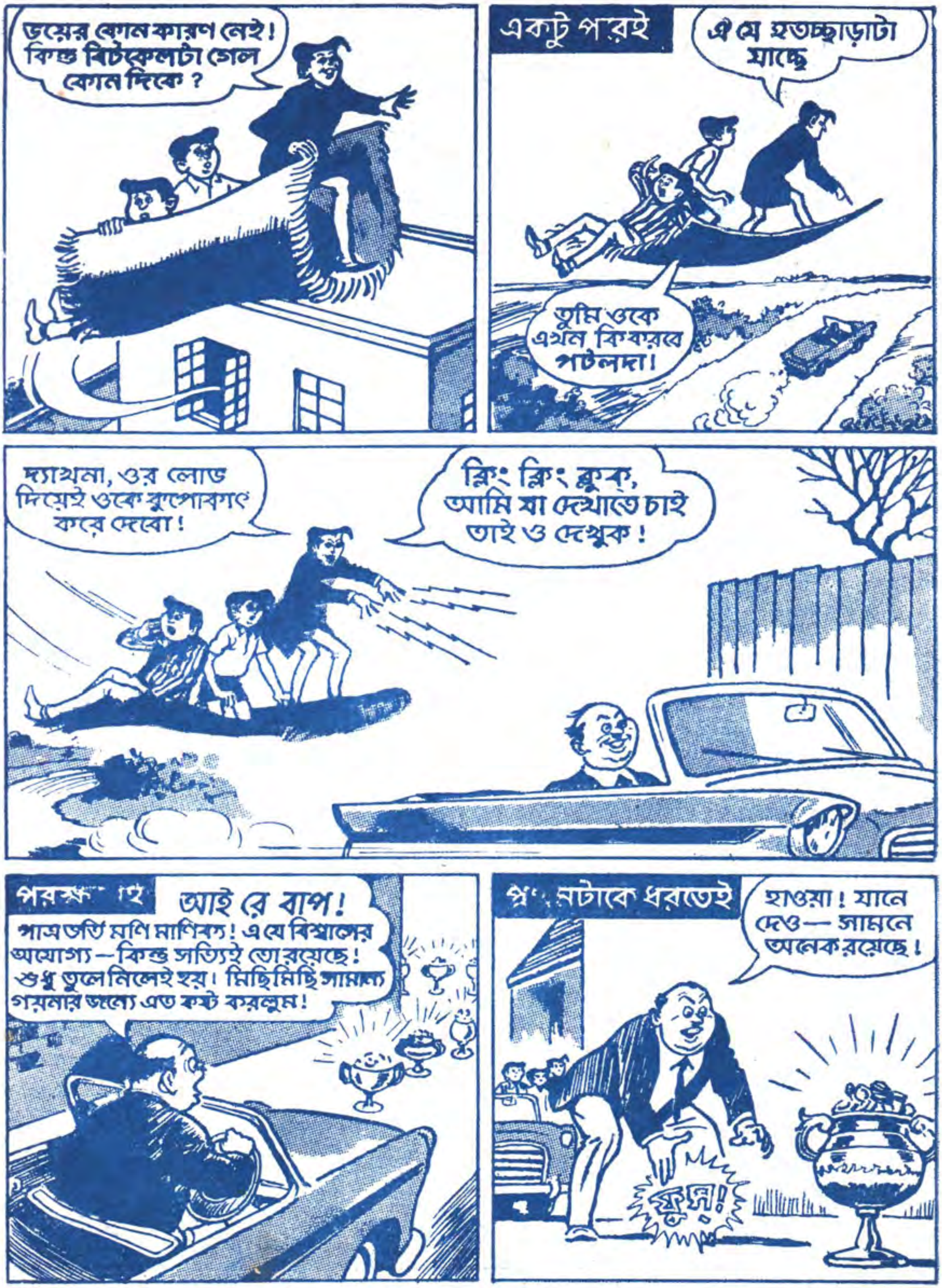

ভয়ের কোন কারণ নেই! কিন্তু বিটকেলটা গেল কোন দিকে ?
একটু পরেই
ঐ যে হতচ্ছাড়াটা যাচ্ছে
তুমি ওকে এখন কি করবে পটলদা!
দ্যাখনা, ওর লোভ দিয়েই ওকে কুপোকাৎ করে দেবো!
ক্লিং ক্লিং ক্লুক, আমি যা দেখাতে চাই তাই ও দেখুক!
পরক্ষ ই
আই রে বাপ!
পাত্রভর্তি মণি মাণিক্য! এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য—কিন্তু সত্যিই তো রয়েছে! শুধু তুলে নিলেই হয়। মিছিমিছি সামান্য গয়নার জন্যে এত কষ্ট করলুম!
নটাকে ধরতেই
হাওয়া! যানে দেও— সামনে অনেক রয়েছে!
ফুস্!

ইঃ! ওগুলোর কি হলো কে জানে, কিন্তু এই ধনরত্নের পাহাড় নিশ্চয়ই হাওয়া হয়ে যাবে না! আর এ তো অজস্র!
আঃ হা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! এ সবই আমার আমি এর চুড়োর ওপরে উঠে পড়ি!
যাদু যখন কাটল
পুলিশ
বাবাগো! এ আমি কোথায় উঠেছি গো! এযে থানা—ও হো-হো, থামতেও পারছি না যে ছাই!
আরে আরে কি বেপার? ঢোনঢোনিয়া বাবু, আবার কার সব্যনাশ করিয়ে আসলেন মোশাই?
হায় ভগবান! ধনরত্নের চুড়ো শেষে কিনা থানার চুড়ো হয়ে গেল!
কিছু পরে
যাক, বেচারা ওর বোনের বিয়ের গয়না ফেরত পেয়ে গেল— কি বলিস?
সত্যি, তুমি দারুণ খেল দেখিয়েছ!
এবারে আরো একটা খেল তোকে দেখাবো, সেটা হচ্ছে, যে দশ মাইল রাস্তা ম্যাজিকে এসেছি সেটা বিনা ম্যাজিকে নিয়ে যাবো।
মানে হেঁটে? ওঃ!

(শেষ)

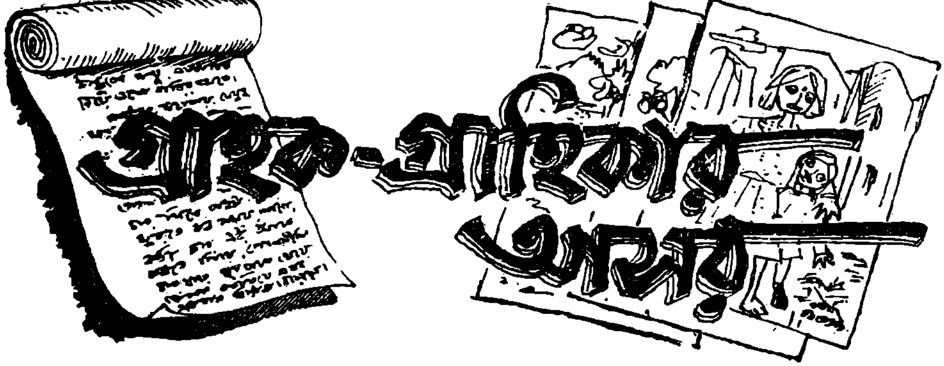

রীতিমতো নাটক !

অলোককুমার ধর

গালে হাত দিয়ে মুখটা একটা হুতুম প্যাঁচার মতো করে বসেছিল ভূতনাথ। ওর টেবিলটার ঠিক উল্টো দিকে মুখ কাঁচুমাচু করে বসেছিল ওর চ্যালা বিশ্বনাথ। বিশে উন্মুখ হয়ে ভূতোর দিকে চেয়ে বলল—'এমন করে আর কদ্দিন চলবে?'

ভূতো মুখ ঝামটা দেয়—'তুই থাম তো!'

—'হ্যাঁ থেমে তো আছিই গুরু, কিন্তু কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি বাতলাও, নইলে পেট চলবে কি করে?'

একটু চুপচাপ। চায়ের দোকানটার অন্য খদ্দেরদের কাপ-প্লেট-চামচের ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছে। ভূতো ওর খালি কাপটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল—'বিশে, আমায় আর এক কাপ চা খাওয়া তো, দেখি আজ যদি কোন প্ল্যানট্ল্যান মাথায় আসে......মিলের চাকরীটা গিয়ে অবধি যা অবস্থা—আমার তো হাতঘড়ি বিক্রির টাকা ফক্কা!'

বিশে মিন মিন করে—'সবই যখন বুঝছো, তবে কেন খামোকা তিনচার কাপ করে চা খাওয়া বাপু! আমারও তো ওই একই অবস্থা—পকেটের যা হাল তাতে কাপের পর কাপ চা খেলে...'

—'ফের কথা!'

মুখ হাঁড়ি করে বিশে আরও এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়।

চা এল। একটু চা খেয়েই ভূতো চোখ বুজে বসে রইল—যেন ধ্যান করছে। কিছুক্ষণ কাটল। আস্তে আস্তে ভূতোর ভ্রূ কুঁচকে উঠছে, হঠাৎ দাঁত দিয়ে সে তলার ঠোঁট কামড়ে ধরল। বিশে ওর পরিবর্তনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, নীচু গলায় ডাকল—'গুরু, ও গুরু!'

ভূতো নিরুত্তর। বিশে ভূতোর আধ খাওয়া চায়ের দিকে দেখছে জুল জুল করে আর ঠোঁট চাটছে। শেষে বলেই ফেললে—'গুরু, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল...বলছি, আমি একটু ঢেলে খাব কি?'

হঠাৎ যেন বোমা ফাটল! ভূতো প্রায় চিৎকার করে উঠল,—'অ্যাইও পেয়েছি!!'

বিশে চমকে চেয়ারশুদ্ধ উল্টে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিলে!

—'কি পেলে গুরু, বুদ্ধি? বলো বলো, বলো গো......'

'বলছি বলছি দাঁড়া, বাকী চা-টা খেয়ে নিই আগে।' —ভূতো এক চুমুকেই চা প্রায় শেষ করে ফেলে। বিশে জুলজুল করে চেয়ে থাকে।

বেশ জমিয়ে বসে শুরু করে ভূতো—'এক কাজ করা যাক। চল্ আমরা ক্ষ্যান্ত পিসীর কাছে যাই। ওই বুড়ীর কাছ থেকে কিছু বাগাতে হবে। ওর কাছে বেশ কিছু নগদ টাকা আছে।'

—'কে ক্ষ্যান্ত পিসী?'

—'সেই যে রে তোকে একবার যার কথা বলেছিলুম, খুব দৈবটৈব মানে, যার সেই খুব ভূতের ভয়! আমার পিসে হরিহর মাইতি বেঁচে থাকতে পিসীমা একবার ভূত দেখে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিল যে, পিসে মশাইয়ের কানে পুরো দুদিন তালা লেগে ছিল!'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। কিন্তু কিভাবে ওর কাছ থেকে বাগাবে?'

—'হুঁ বাবা! এমন এক প্ল্যান করবো! পিসীর না খুব ভূতের ভয়! ভূত বলো, নজর লাগা বলো, হাওয়া লাগা বলো, প্রত্যেকটার জন্য পিসী একটা করে তাবিজ নিয়ে বসে আছে......'

বিশে অধৈর্য হয়—'তাতে আমাদের কি? তুমি প্ল্যানটা বলো তো শুনি।'

গুরু-শিষ্যে বেশ কিছু সময় সলাপরামর্শ হলো চায়ের দোকানে বসে, কেমন করে বুড়ী পিসীমাকে ধোঁকা দিয়ে কিছু টাকা আদায় করবে, তার প্ল্যান হলো।

তারপর দৃশ্য-পট পরিবর্তিত।

কোন এক অখ্যাত গাঁয়ের একটা মাটির বাড়ি। ক্ষ্যান্ত পিসী ঘুঁটে দিচ্ছে। প্রত্যেক বার ঘুঁটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলায় হাতে কোমরে ঝোলান একশ গন্ডা মাদুলী-তাবিজের শব্দ উঠছে ঠন্ ঠন্ করে। ঠিক তখন দুই মূর্তিমান পেঁৗছল। ভূতো গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল পিসীকে। বিশেও করল।

—'ওমা, ভূতো এলি না কি গো? কদ্দিন বাদে দেখা অ্যাঁ! তা হ্যাঁ রে, বাড়ির সব ভাল তো? অ মা, এ আবার কে র‍্যা ভূতো, কি বিচ্ছিরি দেখতে?'

ভূতো সামাল দেয়—'ও আমার বন্ধু গো পিসী!'

—'ও তাই বুঝি, আহা চাঁদপানা মুখ গো তোমার!'

ক্ষ্যান্ত পিসী খুব খাতির-যত্ন করলো গুণধর ভাইপো আর তার বন্ধুকে। সেদিন অনেক রকম রান্না করে তাদের খাওয়ালে। মিলের চাকরী যাওয়ার খবর শুনে মিলমালিকের গুষ্টিশুদ্ধ উদ্ধার করলে নানারকম ভ্যারাইটির সুধাবর্ষণ করে, যথা—মুখপোড়া, ড্যাকরা, হাড়হাভাতে, ঝ্যাঁটাখেকো ইত্যাদি। বাড়ির কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে ভূতো বললে—'বাড়ি যাইনি। ভাবলুম তোমার কাছে অনেক দিন আসিনি, একটু বেড়িয়েই যাই।'

—বেশ বেশ। তা থাক্ না এখানে কদিন। গোলায় ধান আছে, গাছে ফল আছে, বাগানে তরিতরকারীও আছে, চলে যাবে কোন রকমে।'

ব্যস্, ভূতো ও বিশেকে আর পায় কে! সারা গাঁ ওরা কদিন ধরে ঘুরল। কিন্তু কয়েকদিন কেটে যাবার পর দুই শর্মা টের পেলে, ক্ষ্যান্তপিসী বড় কড়া লোক! সহজে কিছু আদায় করা যাবে না। প্ল্যানটাকে বেশ ভালো মতো কাজে লাগাতে হবে।

গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে ভূতো শুনলে, ভূতোর পিসে হরিহর মাইতি বেঁচে থাকতে নাকি একবার ক্ষ্যান্ত পিসীর কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল। তা বুড়ী এমন কিপ্টে যে, নিজের স্বামীকেই টাকা দেয় নি। তাই এখন মৃত্যুর পরও ভূত হয়ে পিসে মাঝে মাঝে টাকা চায় পিসীর কাছে এসে। দু-একবার দেখাও দিয়েছেন ইতিমধ্যে। তাই গাঁয়ের রঘু ওঝার কাছ থেকে মাদুলী-তাবিজ নেবার এই তাড়া পিসীমার। সেবারে বাড়ির উঠোনে একটা ত্রিশূল পুঁতে কিসব পুজোটুজো করেছিল। সেই থেকে নাকি আর হরিহরের ভূতকে দেখা যায় নি।

খবর শুনে ভূতো বগল বাজাতে শুরু করে, আর বিশে নাচ জুড়ে দেয় ধেই ধেই করে। বলে—'গুরু, তাহলে প্ল্যানটা এই লাইন দিয়েই ফলানো যাক!'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!' ভূতো তাল ঠোকে।

সন্ধ্যেবেলা ক্ষ্যান্তপিসী তুলসী-তলায় সন্ধ্যে দিয়ে আসছে পিদিম হাতে। বাড়ির মধ্যে বেশ আলো-আঁধারের খেলা। ভূতোও রেডি—এই সুযোগ! বাড়ির উঠোনে যেখানটায় ত্রিশূল পোঁতা, সেইখানটায় হঠাৎ ছুটে এসে ভূতো ধপাস্ করে পড়ে গেল, মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হচ্ছে।

অত শত পিসীমা বুঝতে পারেনি, বললে—'আ মরণ, ভর সন্ধ্যেবেলা দৌড়-ঝাঁপ কেন র‍্যা?'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভূতো তখন মাটিতে মুখ ঘষছে আর বলছে—আঁমি আঁবার এঁসেছি ক্ষ্যাঁন্ত-মঁণি......রঁঘু ওঁঝা আঁমার কিচ্ছুটিঁ কঁরতে পাঁরেনি, টাঁকা দেঁ...টাঁকা,...টাঁকা দেঁ

পিসীমা বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বিশে ছুটে এল ঘরের ভেতর থেকে—'সর্বনাশ! পিসীমা, ওকে দেখছি ভূতেই পেয়েছে! অনেকক্ষণ থেকেই কেমন যেন করছিল।'

শুনেই পিসীমার হাতের পিদিম উল্টে গেল, কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়লেন তিনি। ওদিকে ভূতো কিন্তু আরও জোরে চালিয়েছে—'তুঁই বুঁড়ী হঁয়েছিস, তোঁর আঁর টাঁকার কিঁ দঁরকার র‍্যাঁ? তাঁ আঁমায় নাঁ দিঁস, ভূঁতোকে দেঁ, নঁইলে আঁমি যাঁব নাঁ কিঁছুতেই, বুঁঝলি!'

অন্ধকারে রীতিমতো রহস্যময় নাটক। বিশে পিসীমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললে—'ওকে ভূতে পেয়েছে পিসীমা, শীগ্গীর একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন...ভূতোর পিসে এসেছে!...'

শুনতেই ক্ষ্যান্ত পিসী একবার শুধু কঁকিয়ে উঠলেন—'ভূ-ভূ-ভূত! আঁ-আঁ......আঁই......'

ব্যস্, পিসীর দাঁতে দাঁত কপাটি লেগে গেল—তিনি জ্ঞান হারালেন। আর পিসীমার চিৎকার তো! সে চিৎকারে পিসের কানে দুদিন তালা লেগে ছিল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আশপাশ থেকে পড়শীরা ছুটে এল।

বিশে ওদের বোঝায়, ব্যাপারটা কি হয়েছে। কেউ তখন পিসীমাকে হাওয়া করছে, কেউ জল দিচ্ছে। সে এক এলাহি কান্ড! কিন্তু ভূতোর এসবে নজর নেই, সে সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।' গাঁয়ের মোড়ল রঘু ওঝাকে নিয়ে এসে পড়ল।

রঘু কটমট করে দেখল খানিকক্ষণ। বিশে রঘুকে বোঝাতে যেতেই রঘু ঝাঁঝিয়ে উঠল—'থাম দিকিন! জেবনে অনেক ভূত দ্যাখলুম। আর এ তো ছ্যালে মানুষ! দেক না কি করি!'

বিশে দেখলে বেগতিক। কিন্তু ভূতোকে বলার উপায় নেই যে, ওঝা ব্যাটা কি করতে যাচ্ছে, সে তো উপুড় হয়ে পড়ে সমানে বকবক করে চলেছে!

রঘু তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে ভূতোর কাছে এল। একটা পেল্লায় ধুনুচিতে কি সব সাদা গুঁড়ো দিল, অমনি ধোঁয়ায় জায়গাটা ভরে গেল। তার হাতে একটা ঝ্যাঁটা! সে জিজ্ঞেস করলে চেঁচিয়ে—'কে তুই বল্?'

ভূতো উপুড় হয়ে শুয়েই জবাব দিলে—'আঁমি হঁরি-হঁর......আঁমি—'

কথা শেষ হলো না, রঘু ধুনুচি থেকে খানিকটা গরম গুঁড়ো ওর গায়ে ছিটিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ভূতো ছিলা-কাটা ধনুকের মতো বেঁকে উঠল—'আঁই!' পরক্ষণে সে মুখ ফিরিয়ে দেখে, সর্বনাশ! রঘু ওঝা এক হাতে ঝ্যাঁটা আর এক হাতে জুতো নিয়ে তৈরী!

মরেচে, সব প্ল্যান বানচাল! আর রক্ষে নেই!

আর বিশে? তার দুই হাঁটুতে ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গেছে। আসল ব্যাপার যদি জানাজানি হয়, তা-হলে সে যে ঠ্যাঙানিটা খাবে—ওরে ব্বাবা!

সে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে দেখছে, ভিড়ের মধ্যে ভূতো কি করে।

ভূতোর প্ল্যানই শুধু বানচাল নয়, ভূতো নিজেও তখন বানচাল। একবার সে কঁকিয়ে উঠতে গেল—'ওগো আমি ভূতো, আমার ভূত ছেড়ে গ্যাছে!'

কিন্তু তা আর বলা হলো না। ধাঁই করে জুতোর এক ঘা পড়ল ওর গালে। 'উঁক্' করে উঠে ভূতো উল্টে পড়ল। সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'আমাকে মের না...'

রঘু দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল—'না মারব না! কেন তুই আবার ক্ষ্যান্তমণিকে জ্বালাতে এসেছিস্?' বলতে বলতে ঝ্যাঁটা-জুতো এক সঙ্গে চলতে শুরু করল।

ঝপাং ঝপাং করে ভূতোর ওপর ঝ্যাঁটার ঘা পড়ছে। আর ভূতো যন্ত্রণায় হাঁউমাউ করে কাঁদছে। আর রঘু চেঁচাচ্ছে—'আর আসবি ক্ষ্যান্তমণিকে জ্বালাতন করতে? মরে গিয়েও শয়তানি! অ্যাঁ, বল্, আর আসবি?'

ভূতো বুকফাটা আর্তনাদ ছাড়লে—'না না, আসব না, আর আসব না, কক্ষণো না! এই কান মলছি, নাক খৎ দিচ্ছি!'

রঘু বলে—'হ্যাঁ নাক খৎ দিয়ে তবে যা। নইলে খ্যাংরা খাবি আবার।'

ভূতো নাকখৎ দিল।

বড় জবর দৃশ্য, ভূতো নাকখৎ দিচ্ছে! সবাই দেখলে, বিশে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল। নাক খৎ দিয়ে ভূতো আর দাঁড়াতে পারল না, ধপাস করে শুয়ে পড়ল নিঃসাড় হয়ে। যা ঠ্যাঙানি খেয়েছে! তার ওপর সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ—ছ্যাঁকা লেগেছে!

ততক্ষণে ক্ষ্যান্তপিসীরও জ্ঞান হয়েছে। সব দেখে শুনে তিনি বললেন—'আহা, এত লোক থাকতে কিনা ভূতোকেই ধরলে শেষকালে!'

রঘু ওঝা বললে—'কিচ্ছু ভাববেন না, মাঠাকরুণ, সব ঠিক হয়ে যাবে। যা ওষুধ আজ পড়েছে, আর সহজে আসবে না ইদিকে।'

বিশেকে দেখে রঘু বলল—'বিশুবাবু, তুমি তো ভূতোবাবুর সঙ্গে থাকবে। তোমার যাতে ক্ষতি না হয়, তার জন্য একটা মাদুলী নাও আমার কাছ থেকে। বেশী না, তিন টাকা পড়বে, ভূতোবাবুকেও দোব' খন, যাতে আর যেন ওর ওপর ভূত হামলা না করে।'

বিশে থতিয়ে যায়—'অ্যাঁ তিন টাকা? আ-আচ্ছা।'

মাদুলীটা নিয়ে পকেট থেকে সে বার করে দেয় তিন-তিনটে টাকা! হাউহাউ করে তখন তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

তার পর দিনই ভূতো আর বিশে—গুরু-শিষ্য দু-জনে—শহরে রওনা দিল। গায়ে একগাদা মাদুলী, তাবিজ আর তাগা। বলা বাহুল্য মাদুলী-তাবিজগুলো রঘু ওঝা আর ক্ষ্যান্ত পিসী ওদের দিয়েছে।

তেষ্টা মেটাবার উপায়

উত্তমকুমার বটব্যাল

দাঁড়া দাঁড়া যাস্ নে, শুনে যা রে কেষ্টা,
পেয়ে যদি থাকে তোর খুব জল তেষ্টা,
বলে দিই তবে তোরে কথাটার শেষটা,
মুছে যাবে মুখ থেকে বিষাদের লেশটা।

মিশ্‌মিশে কালোজাম কখনো কি দেখেছিস ?
মিষ্টিতে যেন মধু জিভে তারে চেখেছিস ?
টুক্‌টুকে রাঙা আম কখনো কি খেয়েছিস ?
ঝড়ে পড়ে টুপ্‌টাপ্ কখনো কি পেয়েছিস ?
রসে ভরা টুব্‌টুবে সেই যে আঙুর ফল,
নাম যার শুনে তোর জিভ বেয়ে নামে জল।

টপাটপ্ ওই জল খেয়ে নিবি কেষ্টা,
নিমেষের মাঝে তোর মিটে যাবে তেষ্টা।

এখন আমি

অশোক চক্রবর্তী

এখন আমি কলেজ যাবো
এখন আমি হয়ে গেছি বড়ো
এখন আমার বোধ হয়েছে
এখন আমায় বলবে না কেউ 'পড়ো'।
এখন আমার ইচ্ছে জাগে
ইচ্ছে জাগে, বলি এ-সব কথা
বুক ফুলিয়ে; কিন্তু যে হায়......
আমি নাকি 'দায়িত্ববান সদা—
ছোটোবেলার থেকে !'
সত্যি বটে,—বলতে পারো
বাইরে আমায় দেখে।
কিন্তু আমার মনখানা যে
ছট্‌ফটিয়ে ছট্‌ফটিয়ে—মানতে
চায়নি কিছুই। এখন আমায়
হবেই যে সব জানতে॥

আমার দেশের কিশোর

স্বরজিৎ সাঁতরা

আমার দেশের ভাবীকাল তোমরা কিশোর দল,
আমার দেশের নীল নভে তোমরা তারকাদল।

আমার দেশের তোমরা হবে বৈজ্ঞানিক ও কবি,
আমার দেশের তোমরা কেহ আঁকবে কত ছবি।

আমার দেশের কিশোর দল হবে দার্শনিক,
আমার দেশের নবীন প্রাণ হবে সাহিত্যিক।

আমার দেশের নবীন আশা হবে মজুর কিষাণ,
আমার দেশের বীর সৈনিক, কত চালাবে বিমান।

আমার দেশের চির সবুজ তোমরা বীর কিশোর,
আমার দেশের দুঃখে সবে ফেলবে আঁখিলোর।

আমার দেশের ভবিষ্যৎ, তোমরা কিশোর দল
আমার দেশের তোমাদের যাত্রা হোক সফল।

সুজনবন্ধু

কলকাতা-৫ থেকে **অবনীকুমার রায়** লিখেছে ঃ

প্রিয় সুজনবন্ধু, কিশোর ভারতীর মধ্যে 'খোলা মনের মেলাতে' নামে যে বিভাগটি রয়েছে, সেটা কিশোরদের মনের কথা বলবার সত্যিই একটা যোগ্য স্থান। তাই ভাবলুম, বহু দিনের পুঞ্জীভূত কয়েকটা কথা সুজনবন্ধুকে বলি।......

আচ্ছা, সুজনবন্ধু, আমরা এখন পড়াশুনা করি কেন? বাবা-মা আমাদের পড়াশুনা করতে বলেন কেন? নিশ্চয় এর পিছনে কারণ রয়েছে। আমরা পড়াশুনা করি যোগ্য মানুষ হবার জন্য, ভবিষ্যতে সুখী হবার জন্য, দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য,......আর বাবা-মা মনে করেন, ছেলে মানুষ হবে, শিক্ষিত জ্ঞানী হবে, নাম হবে, যশ হবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী ও সুন্দর সংসার গড়ে তুলবে। ফলে মাতাপিতার শেষ জীবনটাও ভালভাবে কাটবে।......যখন নীচের ক্লাসে পড়তাম, তখন এসব কথা মনে হয়নি যা আজ হচ্ছে। আজ দীর্ঘ বার-তের বছর পড়াশুনা করে ভাবছি, আমাদের ভবিষ্যতে কি আছে, কি হবে? আমাদের নেই কোন অবলম্বন যার উপর নির্ভর করে আমরা এগিয়ে যাব। আজকাল চাকরির আশা না করাই যেন ভাল। অন্য পথ ব্যবসা, কিন্তু মূলধন বা পুঁজি কোথায়? কি করবো, কি করে বাবা-মায়ের মুখে একটু হাসি ফোটাব,—আপনি দয়া করে বলে দিন। এইভাবে হতাশার গ্লানিভারে জর্জরিত হয়ে আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন হয়ে দেশের অসংখ্য তরুণ হারিয়ে ফেলছে তাদের অন্তরের সৎপ্রবৃত্তিগুলি। রকে, রাস্তায়, পার্কে তারা আড্ডা দেয়। অসৎ উপায় অবলম্বন করে। নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে ফেলে। তার ফলে সমাজ-জীবনে আসে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা।

ভাই অবনী, তোমার চিঠিখানা পড়তে পড়তে দুঃখ ও দুর্ভাবনায় মন ভারী হয়ে ওঠে। সারা দেশে জুড়ে জীবন ও যৌবনের যে নিদারুণ অপচয় চলেছে, তার মূলে আছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা-বোধ—সুযোগ-সুবিধার অভাব। আর তার থেকেই আসছে হতাশা। এই হতাশাই কৈশোর ও তারুণ্যের একটা বড় অংশকে আজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে পঙ্কিলতার অন্ধকার পথে। তোমার চিঠিতে এটা ফুটে উঠেছে পরিষ্কারভাবে। দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর ও তরুণের অন্তরের কথাই তুমি ব্যক্ত করেছ।

শিক্ষা, শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে যে আমূল সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী ও জরুরী, তা কোন দিনই হলো না। তার ফলে চাকরিই বলো আর ব্যবসাই বলো, জীবিকার সমস্ত পথই আজ রুদ্ধ-প্রায়. দেশ এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। দেশের নেতাদের আজ এদিকে নজর নেই, একচক্ষু হরিণের মতো তাঁরা যা করছেন, তাতে দুর্নীতি ও নৈরাশ্য আরও গাঢ় হচ্ছে, সর্বনাশ আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

এর থেকে মুক্তির পথ কোথায়? রেডি-মেইড কোন সমাধান বা পথ-নির্দেশ তো আমার জানা নেই, ভাই। সুদীর্ঘকাল ধরে এ সম্পর্কে কাগজে কাগজে অসংখ্য নেতার অসংখ্য গালভরা বাণী পড়ে আসছি। কিন্তু আমি তো নেতা নই, অমন সুন্দর সুন্দর বাণী দেবার ক্ষমতাও আমার নেই। ভয়াবহ দারিদ্র্য ও অসহায়তা থেকে দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তির আন্তরিক প্রয়াস কোথাও নেই, আছে শুধু কথা আর কথা—শুধুই কথার ফুলঝুরি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনোহর আশার কুহেলি-রচনা।

তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, তাহলে কি করণীয়? মুক্তির কি কোন পথ নেই? আমি বলবো, নিশ্চয়ই আছে। আগেও যা বারবার বলেছি, আজও আবার তাই বলবো। মুক্তির পথ তোমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। এই সর্বব্যাপক দুর্দশার মূল কারণ খুঁজে বের

করতে হবে সবার আগে। তারপর তাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। এজন্য দরকার প্রচুর পড়াশুনা করার, গভীরভাবে সবকিছু চিন্তা ও বিশ্লেষণ করার। এ ছাড়া, ভাই, মুক্তির সহজ কোন পথ নেই। বিশাল আমাদের দেশ, পঞ্চাশ কোটি মানুষের মাতৃভূমি। সর্বনাশ আজ তাকে গ্রাস করছে। সেই সর্বনাশ ও অন্ধকারকে বিদূরিত করে দেশে নবজীবনের আলোর স্পন্দন জাগাতে হবে তোমাদেরই। এ কাজ মোটেই সহজ নয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্য এবং তার বাইরেও মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশুনা করো তোমরা, দেশের খেটেখাওয়া গরীব মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করো আর চিন্তা করো সেইসঙ্গে,—নিশ্চয়ই তাহলে খুঁজে পাবে সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত পথ। সে পথ ব্যক্তিগত জীবনে চলার পথও বটে। মনে রেখ, কঠিন ও দুর্গম হলেও সে পথ চিরকালই মুক্তিপাগল মানুষের পথ। আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন যদি থাকে, তোমরা নিশ্চয়ই সফল হবে। আর তাহলেই নতুন জীবনের পত্তন হবে দেশের বুকে।

কলকাতা থেকে **অজয় কুমার দত্ত** লিখেছে ঃ

প্রিয় সুজনবন্ধু, কিশোর ভারতীর ফাল্গুন (১৩৭৫) সংখ্যার 'খোলামনের মেলাতে' বিভাগের অতনু চৌধুরীর পত্রের ও আপনার উত্তরের প্রতি আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সত্যিই যে-সিলেবাসের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে সেই বোঝা কাঁধে নিয়ে আমরা কতটুকু পথ চলতে পারব তাই ভাবি। এত বোঝা নেবার ফলে আমাদের মেরুদণ্ড শক্ত তো হবেই না, বরং ক্রমশঃ অশক্ত হয়ে যেতে থাকবে। আমি নিজেও একজন ছাত্র বলে একথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। এর ওপর আবার শুনছি যে বিদ্যালয়ে নাকি 'দ্বাদশ শ্রেণী' চালু করা হবে। কিন্তু এতে লাভটা কি হবে বলতে পারেন ? আমাদের গরীব দেশের বেশীর ভাগ ছাত্রই এস্. এফ্. বা এইচ্. এস্. পাশের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে তাদের ওপর আরও একটি বছর চাপানো একটা অকারণ হয়রানি নয় কি? আমাদের তো মনে হয় না এতে ছাত্ররা আরো বেশী জ্ঞান লাভ করবে। এছাড়া একটা বছর স্কুলে পড়ানোর ব্যয়-ভারও তো কম নয়। তাই দ্বাদশ শ্রেণী চালু করা মোটেই সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না।

ভাই অজয়, তোমার কথাগুলো শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই ভেবে দেখবার মত। পাঠ্যের চাপ সম্বন্ধে আগেও আলোচনা করেছি। সত্যি, পাঠ্যের বোঝা বইতে গিয়ে বিদ্যার্থীর মেরুদণ্ডই যায় ভেঙে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী'র কথাই মনে আসে।

দ্বাদশশ্রেণীর স্কুলে সমস্যা আরও বাড়বে বলেই মনে হয়। একাদশ-শ্রেণীতে উন্নীত বেশির ভাগ স্কুলই নানা সমস্যায় জর্জর। দ্বাদশ শ্রেণী চালু হলে সেসব সমস্যা আরও তীব্র হয়ে উঠবে। আর্থিক অনটন, শিক্ষকের অভাব, রুটিন করার অসুবিধা, প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব ইত্যাদি সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। তাছাড়া, অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে বেশী বয়সের ছেলেদের এক স্কুলে রাখা আদৌ উচিত হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব অসুবিধাগুলো চেষ্টা করলে দূর করা সম্ভব হত, তার ধার-কাছ দিয়ে না ঘেঁসে বারো ক্লাসের ধুঁয়া তোলার কোন অর্থ হয় না। কলেজের অংশ ইস্কুলের গণ্ডির মধ্যে আনারও কোন প্রয়োজন নেই। দশ-ক্লাস স্কুলে পাঠক্রম, রুটিন, শিক্ষণ, শৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা দিক থেকে যে সংহতি ছিল, একাদশ-শ্রেণীর স্কুলে নানাকারণে তা বিঘ্নিত হচ্ছে, বারো-ক্লাস স্কুলে তা একেবারে ভেঙে পড়বে। বারো-ক্লাসের বদলে আবার সেই দশ-ক্লাস স্কুল হলেই বরং ভালো হয়। তা যদি না-ও হয়, দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্র যদি বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চায়, সে পথ খোলা থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

নিজে করো

সূর্যঘড়ি

সমীরকুমার ঘোষ (বিশ্বভারতী)

প্রাচীন কালে সময় নির্ধারণের জন্য মানুষের এখনকার মত আধুনিক ঘড়ি ছিল না। তখন যে জিনিসের সাহায্যে মানুষ সময় নির্ধারণ করত, তার নাম ছিল 'সূর্যঘড়ি' (sundial)। একটি কাঠি বা কার্ডবোর্ড, যাকে বলা হয় gnomon, সূর্যের আলোয় রাখা হত এবং ঐ কাঠির বা বোর্ডের ছায়া দেখে সময় নিরূপণ করা হত। ঐ রকম একটি সূর্যঘড়ি তোমরাও খুব সহজে তৈরি করতে পার। কিভাবে তৈরি করতে হবে, তা নিচে দেখ।

হেরফের হলেও কোনো ক্ষতি নেই।

(২) একটি ত্রিভুজাকৃতি কাঠের বা কোনো ধাতুর তৈরী টুকরা। এরই ছায়া দেখে সময় নির্ধারণ করা হয়। একে বলে gnomon। আর

(৩) কিছু ভাল আঠা বা adhesive।

ত্রিভুজাকৃতি gnomonটির একটি কোণ সমকোণ হওয়া চাই। এবং তার ভূমিসংলগ্ন কোণটি যে স্থানে এই সূর্যঘড়িটি ব্যবহার করা হবে, সেই স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশের (latitude) ঠিক সমান হওয়া

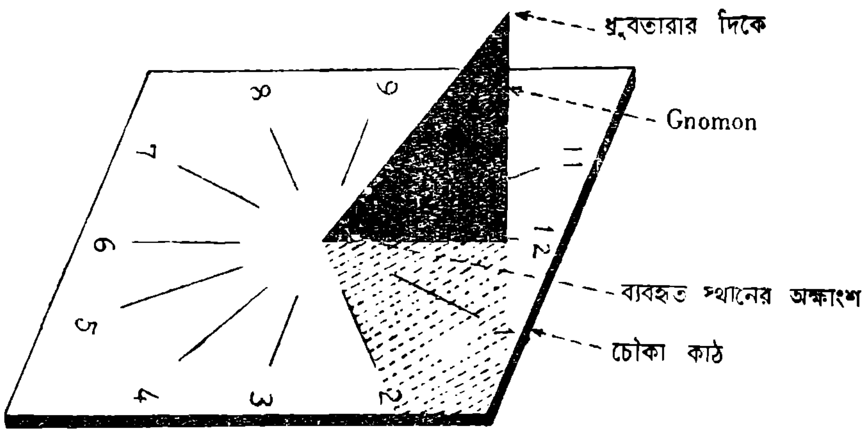

প্রথমেই বলা দরকার যে, যাতে সব রকম ঋতুতে অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে তোমাদের তৈরী সূর্যঘড়িটি ব্যবহার করতে পার, তার জন্য চাই—

(১) একটি ধাতব বা রং-করা চৌকো ভাল কাঠের টুকরা, যার মাপ হবে ধর ২ ফুট লম্বা, ১½ ফুট চওড়া আর আধ ইঞ্চি মত উঁচু। এই মাপের সামান্য

চাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, কলকাতার অক্ষাংশ ২২½ ডিগ্রী। অন্য যেকোন জায়গার অক্ষাংশ তোমরা যে-কোন ভাল মানচিত্র থেকে দেখে নিতে পার। সমকোণী ত্রিভুজাকৃতি gnomonটিকে ১-নম্বরের ঐ চৌকো কাঠের উপর আঠা দিয়ে এমনভাবে বসিয়ে দাও, যাতে ত্রিভুজটির অতিভুজ ঠিক ধ্রুবতারার দিকে নির্দেশ করে।

এবার চৌকো কাঠটির উপর gnomon-এ চারিদিকে

সময়নির্দেশক ঘর কেটে দাও। ব্যস্, হয়ে গেল তোমাদের সূর্যঘড়ি। এবার বাড়ীর ছাদে বা বাগানে, যেখানে সূর্যের আলো সারাদিনই পাওয়া যায়, সূর্যঘড়িটিকে বসিয়ে দাও। gnomonটির ছায়া চৌকো কাঠের যে অংশে যখন থাকবে, সেইটাই নির্দেশ করবে তখনকার সঠিক সময়।

সূর্যঘড়ি ঠিকমত সময় দিচ্ছে কিনা তোমাদের ঘড়ির সঙ্গে দু-চারবার দেখে মিলিয়ে নিতে পার। ঠিকমত বসাতে পারলে দেখবে যে, আর ঘড়ি না দেখে শুধু ছায়া দেখেই তোমরা সঠিক সময় বলে দিতে পারছ।

বিজ্ঞানের টুকরো কথা

অণুবীক্ষণ সমাদ্দার

ফুলস্টপের ওজন

ফুলস্টপ, মানে ইংরেজী বাক্যের শেষে একটা যে ফুটকি দেওয়া হয়, তার আবার ওজন! কতই বা হবে?—অবাক হয়ে ভাবছ বোধ হয়। কিন্তু জানো তো, বিজ্ঞানীরা কোনো কিছু পরীক্ষা না করে ছাড়েন না। তাই 'নিউ ব্রান্স্ উইক এটমিক এনার্জি'র বিজ্ঞানীরা একবার পরীক্ষা করতে বসলেন—ফুলস্টপের ওজন কত! শেষে বললেন, ফুলস্টপের ওজন হলো ·০০০০০০০৩৫ আউন্স অর্থাৎ এক আউন্সের ১০০ কোটি ভাগের ৩৫ ভাগ! ওজনটা তাঁরা হাতে নাতে পরীক্ষা করেও দেখিয়ে দিলেন। তাহলে বোঝ ব্যাপারটা!

ট্যাঁকঘড়ির অংশ

ট্যাঁকঘড়ি আবার কতটুকুই বা! কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে অনেক অনেক স্বতন্ত্র অংশ। তাও কত, জানতে চাও নাকি? শুনলে অবাক হবে, ট্যাঁকঘড়ির মত ঐ ছোট্ট ঘড়িতেই প্রায় দেড় শ' অংশ থাকে।

রাবণের চিতা

রামায়ণে পড়েছ, রাবণের চিতা কোনো দিনই নেভে না। তাই এখনও নাকি রাবণের চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। আঙুল দিয়ে কান দুটোকে চেপে ধরো, শুনবে 'গর্‌গর্' করে একটা শব্দ। সবাই বলে, ওটাই নাকি রাবণের চিতার আগুনের শব্দ!

কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, ওটার পিছনে বিজ্ঞান-সম্মত কারণ আছে। কানের বাইরের দিকে একটা নল আছে। তেমনি কানের পর্দার পাশেও একটা গর্ত আছে, তাকে বলে 'অস্টাচিয়ান টিউব'। ওটা বাতাসে পূর্ণ হয়ে থাকে। ঐ অস্টাচিয়ান টিউবের বাতাসের একটা চাপ আছে তো। আমরা যখন কান চেপে ধরি, তখন বাইরের দিকের গর্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ভিতরের ঐ বাতাসের চাপে কানের পর্দার মধ্যে একটা কম্পনের সৃষ্টি হয়। আর সেই কম্পনের জন্য যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকেই আমরা বলি 'রাবণের চিতা'র শব্দ!!

অমল মজুমদার

অদ্ভুত আগুন

জাদুকরেরা মাঝে মাঝে একটা খেলা দেখান। তারা কালো রং-এর একটা গুড়ো জিনিষ দর্শকদের দেখিয়ে বলেন, 'এটা রাবণের চিতাভস্ম', এবং শিশিতে একটা তরল পদার্থ দেখিয়ে বলেন, 'এটা মন্দাকিনীর চোখের জল। এই দুটো জিনিষ একত্রে মিলিত হলেই আগুন জ্বলে উঠবে।' আগুন জ্বালিয়ে দেখানও তাঁরা। আসলে এটা কিন্তু দুটো জিনিসের সম্পূর্ণ রাসায়নিক মিলনের ফল। ইচ্ছে হলে, তোমরাও এই খেলা দেখাতে পার।

কোন ডাক্তারখানা থেকে সামান্য একটু 'পটাশ-পারম্যাঙ্গানেট্' এবং একটু 'গ্লিসারিন' কিনে আন। পটাশ-পারম্যাঙ্গানেট্ দেখতে কালো রং-এর চিনির দানার মত। এ গুলোকে মোটামুটি গুঁড়ো করে নাও। এবার ছোট্ট এক টুকরো তুলোর উপর সামান্য একটু গুঁড়ো-করা পটাশ-পারম্যাঙ্গানেট্ রেখে তার উপর এক ফোঁটা গ্লিসারিন দাও। মিশ্রণটাকে মাঝখানে রেখে তুলোর টুকরোটাকে ভাঁজ করে তাড়াতাড়ি দু আঙুলের সাহায্যে একটু চাপ দাও। সঙ্গে সঙ্গে শিখাসহ আগুন জ্বলে উঠবে। কিন্তু সাবধান! হাত পুড়িয়ে ফেল না যেন।

রং বদলান

বন্ধুদের সামনে চায়ের কাপে চিনি মিশিয়ে চা'কে সাদা জলে পরিণত করে দিতে পার। এটাও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল।

কোন Photo Studio থেকে সামান্য 'হাইপো' এবং ডাক্তারখানা থেকে একটু 'আইডিন' কিনে আন। হাইপো দেখতে বড় বড় চিনির দানার মত। এগুলোকে গুঁড়ো করে সাধারণ চিনির দানার মত কর। এক কাপ জল নিয়ে তার মধ্যে কিছুটা আইডিন দাও। দেখতে চায়ের মত হবে। এবার কাপের মধ্যে গুঁড়ো-করা সামান্য হাইপো দিয়ে একটু নেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের রং চলে গিয়ে সাদা জল হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! উক্ত দুটি জিনিসের কোনটাই যেন কারো মুখে না যায়।

শব্দ-হেঁয়ালি

পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুদের অনুরোধে এবারও আবার শব্দ-হেঁয়ালি দেওয়া হল। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫.১২.৬৯।

বর্তমান সংখ্যার শেষে পৃথক রঙিন কাগজে এই শব্দ-হেঁয়ালির ছকটি দেওয়া আছে, তোমরা সেটাই পূরণ করে পাঠাবে।

পাশাপাশি

১। প্রধান নৌ-সেনাপতির উপাধি; ৫। বাধা; ৯। করুণাময়; ১০। যে সম্পত্তি বা সম্পদ ঋণাদি পরিশোধে ব্যবহার করা যায়; ১১। ঢেঁকির মোনা; ১২। সরু ও নরম বাঁশ-বিশেষ; ১৩। ঘর; ১৪। লেখক; ১৭। মধু; ১৯। ঘৃত; ২০। আর্ত; ২১। আকাশ দেশ; ২৩। চীনা ফলবিশেষ; ২৫। কাঁটাল; ২৬। সুগন্ধ শিকড়যুক্ত তৃণবিশেষ; ২৭। বাঁশ কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত সিঁড়িবিশেষ; ২৮। বসন্ত ঋতু; ৩১। বিপরীত; ৩২। বিচলন; ৩৪। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা; ৩৬। জন্মগত; ৩৭। সমুদ্র।

উপর থেকে নিচে

১। প্রধান কেরাণী; ২। সংস্রব; ৩। অপহৃত বস্তু; ৪। হয়-এর সম্মান-সূচক সম্বোধন; ৫। ছায়াপথ; ৬। স্বাদ; ৭। শিহরণ; ৮। তারপর; ১০। ২৪ সেকেন্ড; ১২। সঞ্চিত টাকাকড়ি; ১৩। সংসারী লোক; ১৫। তামা ও দস্তা মিশাইয়া প্রস্তুত উপধাতুবিশেষ; ১৬। পদ্মের ন্যায় হাত; ১৮। কম্পন; ২২। পানসে; ২৪। পরিপূর্ণ; ২৫। কেশ-প্রসাধন দ্রব্যবিশেষ; ২৬। অতিভাষী; ২৯। সাহায্য; ৩০। সহিত; ৩৩। শরম; ৩৫। বিনাশশীল।

[এই শব্দ-হেঁয়ালি ছকটি তৈরি করেছেন কিশোর ভারতীর একজন পাঠক ভাগবত, দরিপা, চাণ্ডিল।]

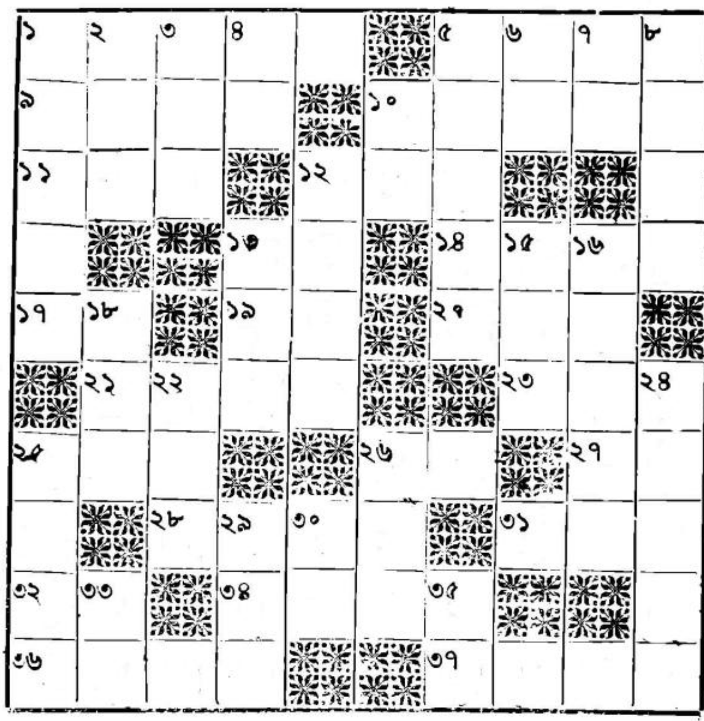

গত ভাদ্র মাসের ধাঁধাগুলোর উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

ভাদ্র মাসের সব কয়টি ধাঁধার নির্ভুল উত্তর কেউই দিতে পারনি। অর্থাৎ এবার তোমরা হেরে গিয়েছ। আশা করব, বর্তমান সংখ্যার শব্দ-হেঁয়ালির উত্তর তোমাদের সকলেরই সঠিক হবে।

১। (ক) পুরুলিয়া (খ) মুসৌরী (গ) মাদ্রাজ (ঘ) কেরালা (ঙ) কলিকাতা (চ) ভুবনেশ্বর (ছ) হরিয়ানা (জ) ভাগলপুর (ঝ) মহারাষ্ট্র (ঞ) মুর্শিদাবাদ (ট) আগরতলা (ঠ) মধ্যপ্রদেশ।

২। প্রিয় বন্ধু,

অনেকদিন হল তোমার চিঠি না পেয়ে আমি খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হতে চলল অথচ এখনও তোমার একখানা চিঠিও পেলাম না। এরমধ্যে আমার তরফ থেকে তোমাকে তিনখানা চিঠি দিয়েছি। তোমার এই ব্যবহার আমি আশা করি না। সামনে পরীক্ষা বলেই কি তুমি এক-খানা ছোট চিঠি লিখবার সময় পাচ্ছ না? যদি তাই হয়, তাহলেও ত চিঠিতে একটি মাত্র লাইন লিখে জানাতে পার। এবং তা জানালে আমি তোমাকে আর বিরক্ত করতাম না। এবার তোমার কাছ থেকে একখানা ছোট চিঠি নিশ্চয়ই আশা করব।

ইতি পবিত্র শঙ্কর সিংহ

৩। ভদ্রলোক বয়টিকে ১৬ টাকা ভাঙাতে দিয়ে ১২ টাকার খুচরা পেলেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট হলেন। কারণ, ভদ্রলোক হিসাব করে দেখলেন, টাকায় ২৫ পয়সা বাটা হিসাবে ১৬ টাকায় ৪ টাকা বাটা লাগে। কিন্তু ঐ চতুর বয়টি আসলে ১২ টাকার ভাঙানি নিয়ে বাটা বাবদ ৩ টাকা দিল। বাকী ১ টাকা সে নিজে নিল।

৪। বানর।

৫। ভদ্রলোক মাছওয়ালাকে নিম্নলিখিত উপায়ে হিসাবটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন:

$$১ \text{ টাকা} = ১০০ \text{ পয়সা} = (১০ \times ১০) \text{ পয়সা}$$

$$= \left(\frac{১}{১০} \times \frac{১}{১০}\right) \text{টাকা} = \frac{১}{১০০} \text{ টাকা} = ১ \text{ পয়সা।}$$

একটি ভুল

রমা, কুশল, কল্যাণ, উৎপল, বেণু এবং তাদের বাবা ও মা, উষুমপুর; বিনতা ও শ্বেতা রায়, কৃষ্ণনগর; সুগতা, সুতপা, উজ্জ্বল, সুব্রত ও দেবব্রত ঘোষ, নৈহাটী; সত্যব্রত, ভক্তিভূষণ, বিজয়লক্ষ্মী গাঙ্গুলী ও অসীম সেনগুপ্ত; সমীন্দ্র, সৌমেন্দ্র, সৌমিত্র ও শুক্লা কুণ্ডু, কলিকাতা; সুজিৎকুমার ঘোষ, এলাহাবাদ; শঙ্করলাল সাহা, শ্রীরামপুর; তাপস ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হাওড়া ৬; ভাগবত, সমীর, স্বপন, অরূপ ও পল্লব দরিপা, চাণ্ডিল; সুজয়, বিজয়, ঝর্ণা ও বাবু, তিরুচিরাপল্লী ১৬; ভোলানাথ ঘোষ, মেদিনীপুর; অর্চনা ঘোষ, গোবিন্দপুর; রজতশঙ্কর মাইতি, কলিকাতা ৯; মুকুল বিকাশ মাহাত, মেদিনীপুর; কৌশিক সাধু, বাঁকুড়া; ষষ্ঠি, অনাথদা, মদন, রবি ও শ্যামাপদ দাস, সোনামুখী-বাবুপাড়া; সুমন্ত সরকার, বহরমপুর; শিশির, শ্যামল ও চন্দ্রাণী, বাঁশবেড়িয়া; শীলা ও কপিল, কৃষ্ণনগর; কাবেরী, বিশ্বজিৎ, বাসবী ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রীবরা; বুলবুল, বাঁশী এবং তাদের ছোড়দি, বৌদি ও মা, হাজরাপাড়া; শিশির ও কাঞ্চনকান্তি রায়নাথ, ডিমডিমা চা বাগান; মালবিকা বসু, কলিকাতা ৯; শুক্লা, শুভ্রা, মিত্রা ও চিত্রা, মাশিলা; অমিয়া মিত্র ও বন্দনা চট্টোপাধ্যায়, বাণীপুর; সুজিত, শৈবাল ও শান্তনু মিত্র; কুণাল ভট্টাচার্য, কলিকাতা ৬; অমিত চট্টো-পাধ্যায়, নব ব্যারাকপুর; মৃন্ময়, পূরবী ও বাসুদেব চক্রবর্তী, কলিকাতা ৬; প্রিয়ব্রত রায়, বাসুদেবপুর; অশোক, বিকাশ, আভা ঘোষ ও স্বপন সিন্হা; রঞ্জনা, অঞ্জনা ও শুভ্রজ্যোতি দাস, রাচী; অরুণা মুখার্জী, নূতন দিল্লী ৩।

দুইটি ভুল

উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া; অলক মিত্র, কলিকাতা ৬; বিবেকানন্দ কোনার, প্রবীর কুণ্ডু, অজিত মল্লিক ও কানাইলাল মুখার্জী; সুভাষ ও কান্তিচন্দ্র দারুকা, বাঁকুড়া; বৈদ্যনাথ, সোমনাথ, শেফালী ও মানসী চক্রবর্তী, নৈহাটী; ইন্দ্রজিৎ সরকার, অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও প্রদ্যুত দত্ত, চিত্তরঞ্জন; সজল, কাজল ও ঝর্ণা রায়, আসানসোল; শীলভদ্র, অমিয়, শ্যামানন্দ, জওহর, সুগম, দুলাল ও তাদের দাদু, ছোটপারুলিয়া; সনৎ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৬; কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৫; নীলু, টুলু, রুবী, বুড়ি, ফুলকি ও আনন্দ, আদ্রা; সুমিতা সরকার, দীপিকা বসু ও শংকরী ঘোষ, বাবুপাড়া; আশিস্ কুমার দত্ত, কলিকাতা ৫৫; অলক, অজয়, অশেষ ও উৎপল মাইতি, হাঁসচড়া; দেবাশিস্ তরফদার, কল্যাণী; রবীন্দ্রকুমার পাকড়াশী, বহরমপুর; প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, মেমারী; সুব্রত ও দেবব্রত মুখার্জী, কামাখ্যাগুড়ি; মাণিক, মণি, বাবু ও বাপি, দ্বারভাঙ্গা; শৈলেন ও মালতী কুণ্ডু, পুরুলিয়া; স্বরূপ-কান্তি ও সুস্মিতা ঘোষ এবং তাদের মা, কলিকাতা ৫০; নৃপতি, ধনপতি ও শক্তিপতি, কলিকাতা ৫৮; দেবব্রত রায়, তার মা ও বাবা, কলিকাতা ৫; অসিত ও অসীম দাশগুপ্ত, পুরুলিয়া; বিদ্যুৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীরেন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লধুড়কা; শ্যামল চক্রবর্তী ও শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, জাঙ্গীপাড়া; বিমলকুমার বিশ্বাস, কলিকাতা ১৫; তাপসকুমার জানা, কুলবাড়ী; শঙ্কর ঘোষ, কলিকাতা ১৩; মৃণালকান্তি ও জয়শ্রী সেনগুপ্ত, রায়গঞ্জ; আশিস্ বসাক ও অনুপ রায়, কলিকাতা ৫৭; শিবাংশু, শমিতা ও শৌভিক দে, জামসেদপুর ৪; রুমা গোস্বামী, কলিকাতা ৭; দেবাশীষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা ৭; মিতা পালিত, তার বাবু ও মামণি, কলিকাতা ১৫; পাপিয়া সেনগুপ্ত, দমদম; মোজাম্মেল হক, পশ্চিম দিনাজপুর; সৌরভ রায়, কলিকাতা ৪৩; তরুণকান্তি, তুষারকান্তি ও পাপিয়া চট্টরাজ, ডায়মন্ড-হারবার; তুষার, তরুণ, তাপস ও মৃণাল বারিক, আউস-বেড়িয়া; সৌরভ পুরকায়স্থ, কলিকাতা ৩৫।

ব্যাটিং শেখার গোড়ার কথা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা সেদিন সকালে দল বেঁধে এসে হাজির। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে। উত্তুরে হাওয়ায় একটু একটু করে ঠান্ডার ভাব বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে তাল দিয়ে মাঠে-ময়দানে, পার্কে, গলিতে আরম্ভ হয়ে গেছে ক্রিকেট খেলা। ওরা সেদিন সকালে এসে আমায় টেনে নিয়ে গেল পাড়ার মাঠে। ক্রিকেট খেলা শেখাতে হবে। উপায় নেই। দাদা হওয়ার ঝামেলাই ঐ। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যাট হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হলো।

ইতিমধ্যে আমার চোখ তো চড়কগাছ! ইয়া বড় বড় ব্যাটে খেলছে ছোটরা। কি সাঙ্ঘাতিক কান্ড! চার ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা ছোটকু একটা ফুল সাইজের ব্যাট নিয়ে খেলতে যেতেই আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "করছিস কি, করছিস কি! হাতের বারোটা বেজে যাবে যে!"

আমার কথা শুনে হাসলো ওরা। ছোটকু বললো, "দেখবে, কেমন খেলি।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। ছোটকুর হাত থেকে ব্যাটটা কেড়ে নিলাম। তারপর ওদের বললাম, "ছোটরা যদি বড় আর ভারী ব্যাটে খেলে তাহলে ওদের হাতের মাস্‌ল্‌গুলোয় খুব চাপ পড়ে, ফলে সেগুলো শক্ত হয়ে যায়, ঠিক মতো বাড়তেও পারে না, আর তার ফলে বেশী দিন খেলতে পারে না তারা।"

আমার কথা শুনে ভয়ে ভয়ে ছোটকু জিজ্ঞেস করে, "তাহলে আমাদের কি করতে হবে?"

"কি আর করবে? ছোটরা ছোট ব্যাটে আর বড়রা বড় ব্যাটে খেলবে। ব্যাট কিনতে গিয়ে ব্যাটটা পায়ের পাশে সোজা করে দাঁড় করাতে হবে। ব্যাটটা যদি, হ্যাফ প্যান্টই হোক কিংবা ফুল প্যান্টই হোক, পকেটের নীচের মুখ অবধি হয় তাহলে সেইটাতেই খেলা উচিত। তারপর ঐ মাপের কয়েকটা ব্যাট নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে, কোনটায় খেলতে সুবিধে হচ্ছে। যে ব্যাটটা মনে হবে খুব ভারীও নয় আবার হাল্কাও নয়, অথচ খেলতে বেশ সুবিধে হবে মনে হচ্ছে—সেই ব্যাট-টাই নেওয়া উচিত।"

আমি বলে চললাম,—কিন্তু সবার আগে জানতে হবে ব্যাট নিয়ে কিভাবে দাঁড়াতে হয়। ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গীর ওপরই নির্ভর করে ব্যাটিং করার সব কিছু। ভালো ব্যাটিং করতে হলে, কিংবা ভালো ব্যাটস্‌-ম্যান হিসেবে নাম করতে হলে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী নিখুঁত করতে হবে।

ব্যাটস্‌ম্যান যেখানে ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায়, সেখানে দুটো দাগ থাকে। যে দাগটার ওপর উইকেটগুলো পোঁতা, তার নাম বোলিং ক্রীজ আর যে দাগের ওপর ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায়, তার নাম পপিং ক্রীজ।

বোলারের দিকে মুখ করে পপিং ক্রীজের দু পাশে দু পা রেখে ব্যাটস্‌ম্যানকে দাঁড়াতে হবে ব্যাট নিয়ে। পা দুটোর মধ্যে খানিকটা ফাঁক থাকবে। যার যতোটা হলে সুবিধে হয়, সে ততোটা ফাঁক রাখবে। তবে ব্যাটস্‌-ম্যানের ডান পা-টা থাকবে ক্রীজের মধ্যে আর পায়ের ডগা থাকবে সোজাসুজি। শরীরের ভারটা দু পায়ের ওপর সমান ভাবে রাখার জন্যে বাঁ পা-টা যতোটা দূরে রাখার রাখতে হবে পপিং ক্রীজের বাইরে। বাঁ পায়ের ডগা থাকবে সামান্য বাঁ দিকে ঘুরে অর্থাৎ কভারের দিকে মুখ করে। তাঁর চোখ থাকবে বোলারের ওপর।

ব্যাট নিয়ে খেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়বার পর চোখ কোনমতেই এদিকে-ওদিকে ঘোরানো যাবে না। এই-ভাবে ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ কাঁধটা থাকবে অপর প্রান্তের অর্থাৎ বোলা-রের দিকের উইকেট-মুখো।

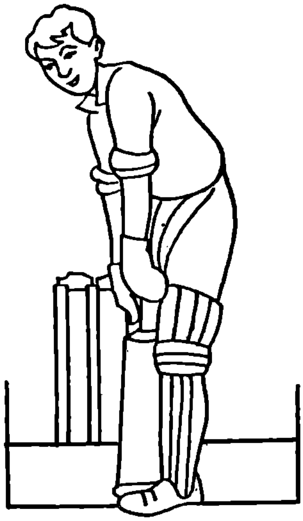

১নং ছবি॥ বোলারের দিকে মুখ করে পাপিং ক্রীজের দু পাশে দু পা রেখে ব্যাটস্‌-ম্যানকে দাঁড়াতে হবে ব্যাট নিয়ে।

বাঁ হাত দিয়ে ব্যাটের হ্যান্ডেলের মাথার কাছে মুঠো করে ধরতে হবে। বাঁ হাতের পিঠটা কভার থেকে মিড অফ অঞ্চলের দিকে মুখ করে থাকবে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের খুব কাছে ব্যাটটা আলতো করে মুঠো করে ধরতে হবে। তবে বাঁ হাতের মুঠোটা হবে খুব শক্ত। দু হাত দিয়ে ব্যাটটা ঠিকভাবে ধরে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের মাথার কাছে ঠিক এক নম্বর ছবির মতো করে রেখে নিখুঁত ভঙ্গীতে দাঁড়াতে হবে।

দু হাত দিয়ে ব্যাটটা ধরার বিষয়ে একটা কথা বলে রাখি। যেভাবে আমরা বললাম ঠিক সেইভাবেই যে ব্যাটটা ধরতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যেভাবে ব্যাট ধরলে যার যতো খেলতে সুবিধে হবে, সে সেই-ভাবেই ব্যাট ধরবে।

ক্রিকেট খেলা দেখতে গেলেই দেখা যায় যে, নতুন ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট করতে এসেই উইকেটের সামনে ব্যাট রেখে আম্পায়ারের কাছে কি যেন জিজ্ঞেস করে নিয়ে পাপিং ক্রীজের ওপর একটা দাগ কেটে নেয়। একে বলে গার্ড নেওয়া কিংবা ব্লক নেওয়া। গার্ড নেওয়া আর কিছুই নয়, উইকেটের তিনটে স্টাম্পের সোজাসুজি দাগ কেটে নেওয়া। এই দাগের ওপর ব্যাট রেখে ব্যাটস্‌-ম্যান দাঁড়ায়। ফলে বল কোন্ স্টাম্প বরাবর আসছে বা উইকেটের বাইরে আসছে কিনা তা সে বুঝতে পারে। অনেক ব্যাটস্‌ম্যান লেগ স্টাম্পে গার্ড নেয়, কেউ বা নেয় আবার মিডল স্টাম্পে। তবে আমার মনে হয়, লেগ স্টাম্পে গার্ড নিলে সব কিছু দেখে খেলার সুবিধে হয় সব থেকে বেশি।

এর পরেই আসে ব্যাট তোলার কায়দার কথা। ব্যাট পেছনে তোলা অর্থাৎ ব্যাক লিফটই হলো ব্যাটস্‌ম্যানের সব থেকে দরকারী জ্ঞাতব্য বিষয়। ব্যাক লিফটে একটু এদিক-ওদিক হলেই ব্যাটস্‌ম্যান আউট হয়ে যাবে। তা ছাড়া ব্যাক লিফট যদি ঠিক মতো না করা যায়, তা-হলে বল মোটেই জোরে মারা যাবে না। ব্যাক লিফট নির্ভুল করতে হলে কয়েক দিন ধরে অনুশীলন করতে হবে। বোলার যখন বল ডেলিভারী করছে, তখন ব্যাটটা পেছনে তুলতে হবে। সে সময় শরীর কিন্তু একদম নড়বে না। চোখও থাকবে বোলারের ওপর। ব্যাক লিফটে

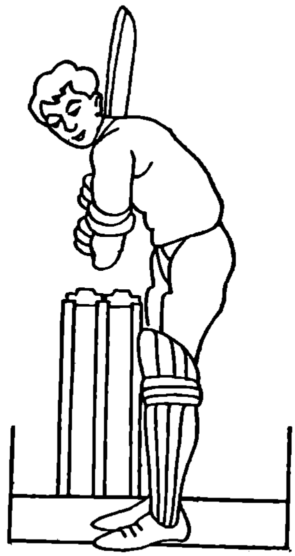

২নং ছবি॥ শরীর কিন্তু একদম নড়বে না। চোখও থাকবে বোলারের ওপর। ব্যাক লিফটে ব্যাটের মাথাটা মিডল কিংবা স্টাম্পমুখো হবে।

ব্যাটের মাথাটা মিডল কিংবা লেগ স্টাম্পমুখো হবে, ব্যাটের ব্লেড থাকবে পয়েন্টের দিকে আর ব্যাটস্‌ম্যানের ডান হাতের কনুইটা থাকবে স্কোয়ার লেগের দিকে মুখ করে—ঠিক দু নম্বর ছবির মতো।

মোটামুটিভাবে এই তিনটি বিষয় রপ্ত হয়ে গেলে, ব্যাটস্‌ম্যান বেশ ভালো ভাবে ব্যাটিং করতে পারবে। তবে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে ব্যাটটা সব সময় স্ট্রেইট্ থাকে। স্ট্রেইট্ ব্যাটে খেলার সুবিধে অনেক। ক্রস ব্যাটে খেললে আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা পদে পদে। তিন নম্বর ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে, কেন সকলে স্ট্রেইট্ ব্যাটে খেলতে বলেন।

যাই হোক, প্রথম দিন ছোটকুদের এইটুকু শেখাতেই আমার অনেক সময় লেগে গেল। তাই তোমরাও আজ এই পর্যন্ত শিখে নাও। এই এক মাসে দাঁড়াবার ভঙ্গী, ব্যাট তোলা আর স্ট্রেইট্ ব্যাটে খেলাটা ভালোভাবে রপ্ত

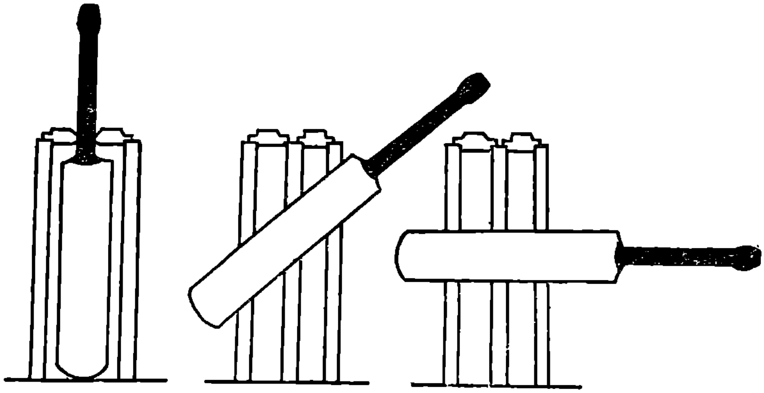

৩২ ছবি ॥ স্ট্রেইট্ ব্যাট আর ক্রস ব্যাটে খেলার পার্থক্য। স্ট্রেইট্ ব্যাটে খেললে উইকেট অনেকখানি আড়াল থাকে, কিন্তু ক্রস ব্যাটে ততোটা থাকে না। তাই যাঁরা ক্রস ব্যাটে খেলেন, তাঁদেরই বেশী সম্ভাবনা থাকে তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবার। তাই স্ট্রেইট্ ব্যাটে খেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

করে নাও, পরের মাসে ব্যাটিং করার আসল কায়দার কথা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেব।

[এর আগেও কিশোর ভারতীর বিভিন্ন সংখ্যায় খেলা-ধুলা-বিভাগে ক্রিকেট খেলার গোড়ার কথা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—যেমন প্রথম বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা, ৫ম সংখ্যা, ৭ম সংখ্যা এবং ১১শ সংখ্যা। সেইসব লেখাগুলো পড়ে নিলে বর্তমান লেখা এবং পরের লেখা-গুলোও বুঝতে বিশেষ সুবিধা হবে।]

খেলার আসর

শ্রীসাংবাদিক

খেলাধুলার বাজার এখন গরম। ফুটবল আর ক্রিকেটই এখন আসর মাত করেছে। ফুটবল খেলায় বাংলা দেশ যে এখনো সবার ওপরে, এ বছর নওগাঁয় অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় সে কথা সারা ভারতকে বেশ ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন বাংলার খেলোয়াড়রা। প্রথম খেলায় বাংলা ৪-১ গোলে হারিয়েছিল গোয়াকে। দ্বিতীয় খেলায় তামিলনাড়ু বাংলার কাছে ৮ গোল খেল। তারপর সেমিফাইনাল খেলায় বাংলা অন্ধ্রকে প্রথমবার ৪-১ ও দ্বিতীয়বার ৬-১ গোলে হারিয়ে দেয়। তারপর ফাইন্যালে উঠে সার্ভিসেসকে ৬-১ গোলে পরাজিত করে সে ছ বছর পরে আবার সন্তোষ ট্রফি জিতে আনলো।

ফুটবলের পরেই আসে ক্রিকেটের কথা। কিন্তু ক্রিকেটে ভারত নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একদম খেলতে পারে নি। বৃষ্টির জন্যে কোন রকমে রাবারটা বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু মনে হয় ভারত রাবারটা হারালেই বোধহয় ভালো হতো। প্রথম টেস্টে ভারত জিতেছিল সত্যিকারের ভালো খেলে। দ্বিতীয় টেস্টে ভারত হেরে গেল বিশ্রী ভাবে আর তৃতীয় টেস্টে হারতে হারতে কোন রকমে বেঁচে গেল বৃষ্টির জন্য। এই তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা যেভাবে খেলেছেন, তাতে আমাদের তো রীতিমত ভয় হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া এসে গেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা শুরু হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের যদি ঐ হাল হয়, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থা না জানি কেমন হবে! যাই হোক, অস্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে পাঁচটা টেস্ট-ম্যাচ—বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, কলকাতা আর মাদ্রাজে। কলকাতায় ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হবে ১২ই ডিসেম্বর। সেই ডিসেম্বর মাসে খেলা, অথচ এখনই টিকিটের জন্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে।

বিল লরী

ভারত-সফররত অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক বিল লরী তাঁর দলের পরম নির্ভরযোগ্য ন্যাটা ওপ্‌নিং ব্যাটস্‌ম্যান। সিম্পসনের কাছ থেকে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্বের ভার নিয়ে লরী এর মধ্যেই নিজেকে অত্যন্ত সফল অধিনায়ক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার ওপর এই বছর লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সোবার্সের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে হারিয়ে যেমন লাভ করেছে ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফি, তেমনি ঐ জয়লাভ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়-দের মনোবল দিয়েছে অনেক বাড়িয়ে। লরীর খেলায় আছে আক্রমণাত্মক মনোভাব। খেলতে নেমেই তিনি নজর দেন রান সংগ্রহের দিকে। এ পর্যন্ত লরী অংশ গ্রহণ করেছেন ৫৩টি টেস্ট খেলায়। ১৩টি সেঞ্চুরী সহ মোট রান করেছেন ৪,৪৭৮। সর্বোচ্চ রান ২১০।

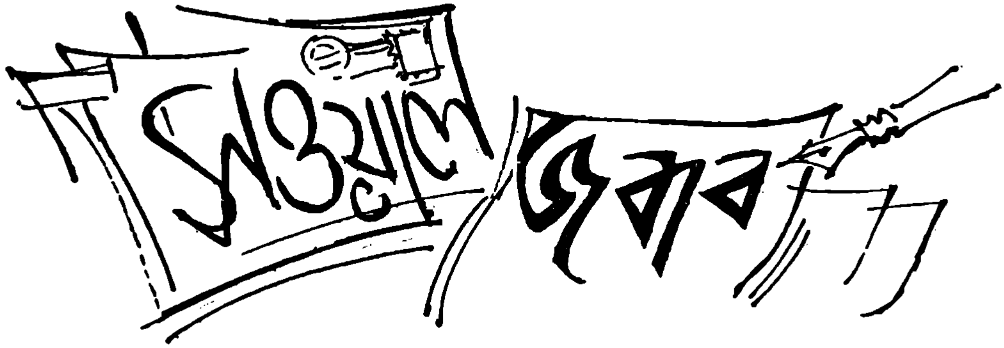

বাণী মৌলিক

এম. কোবাদ আলী, আসাম

—আমার প্রধান অভিযোগ, কেন আমার কবিতা প্রকাশিত হইবে না? আমার অপরাধ কি?

ঃ অপরাধের প্রশ্নই আসে না। উপযুক্ত বিবেচিত হলে যে কোন লেখকের লেখা আমরা প্রকাশ করি।

জওহরলাল পাল, সিংভূম

—সত্যি কি অদ্ভুত পত্রিকা এই কিশোর ভারতী, কি সুন্দর পত্রিকা! অপূর্ব এর দেহসৌষ্ঠব, সারা দেহ যেন ওর সোনাতে মোড়া। হাতে পেলে সারা মন পুলকিত হয়।

ঃ "আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।"

আরতি রানী ভুঞা, মুড়িগংগা

—আমি এই পত্রিকার গ্রাহিকা নই, আমার স্বামী এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। প্রতি মাসে ডাকযোগে কিশোর ভারতী এলেই আমি আগে পড়ি। সত্যি আমার মনের মতো একটি মাসিক পত্রিকা, যা পড়লেই আনন্দে মন রঙিন হয়ে উঠে। মনোমুগ্ধকর, সুন্দর প্রচ্ছদপটে রুচি স্নিগ্ধ এই 'কিশোর ভারতী'।

ঃ কিশোর ভারতী যে শুধু কিশোরদেরই নয়, সকলেরই মন জয় করতে পারে, তার পরিচয় পেয়ে আমাদেরও আনন্দ।

নন্দ প্রামাণিক, মেদিনীপুর

—কিশোর ভারতী দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করলো। তাই আজ বর্ষ-পূরণ উপলক্ষে তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, যাঁদের চেষ্টায় কিশোর ভারতী দ্বিতীয় বৎসরে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ পেল। আর কামনা করি কিশোর ভারতীর বার্তা যেন ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রচারিত হয়।

ঃ কিশোর ভারতীর বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পার কিন্তু তোমরাই।

দ্বীপেন্দ্রনাথ রায়, জলপাইগুড়ি

—বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় শিশুদের কি কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে? থাকলে কয়টি? সম্ভব হলে সেগুলির নাম এবং ঠিকানা জানাবেন।

ঃ বাংলা ভাষায় ছোটদের উল্লেখযোগ্য কোন সাপ্তাহিক পত্রিকা বর্তমানে আছে বলে আমরা জানি না। খবর পেলে জানাব।

—পত্র মিতালী পাতাতে চাই। আমার বয়স ১৫ বৎসর ৬ মাস। এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবো। বিভিন্ন সাহিত্যিকের পুস্তক পাঠ, প্রথিতযশা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ, ফটো তোলা ইত্যাদি আমার শখ বা হবি।

বিদ্যুৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরুলিয়া

—ত্রিশংকু অবস্থা কি?

ঃ ত্রিশংকু হলেন পুরাণে বর্ণিত সেই রাজা, ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাঁকে বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় শূন্যে ঝুলে থাকতে হয়েছিল। সেই থেকেই ত্রিশংকু অবস্থা কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থাটি যে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, আশা করি, বুঝতে পারছ।

ফাল্গুনী বসাক, হাজারীবাগ

—মানুষের স্বাস্থ্য আগে না ধন আগে?

ঃ তোমার প্রশ্নের মধ্যেই কে আগে তার উত্তর খুঁজে পাবে।

শান্তিময় কংশবণিক, নবদ্বীপ

—আজ অনেক কিশোর-কিশোরী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার মত অনেক কিশোর-কিশোরী হয়ত সন্ধান পাচ্ছে না এই কিশোর ভারতীর। আমি আশা করি, কিশোর ভারতী পত্রিকাই অন্ধকারাচ্ছন্ন কিশোর-কিশোরীদের মনের অন্ধকার দূর করবে। আমি চাই কিশোর ভারতীর প্রত্যেকটি সংখ্যা আরও ভাল হবে এবং রামায়ণ-মহাভারতের মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এ থেকে নিশ্চয়ই সকলে আনন্দ পাবে এবং যে যা চায় তাই পাবে।

ঃ তোমার এই আশা 'সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান।'

দেবাশীষ ব্যানার্জী, খড়্গপুর

—কি ভাবে চললে জ্ঞানে, কর্মে, বুদ্ধিতে ও কাজে দক্ষতা অর্জন করা যায়?

ঃ যখনকার যে কাজ, তা তখন করতে হবে অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সংগে।

আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রধরপুর, সিংভূম

—গ্রাহক হিসেবে 'কিশোর-ভারতী'র প্রথম সংখ্যা পেলাম। ভাবতেই আনন্দ লাগছে। বহুদিন পরে একটা মনের মত পত্রিকা পেয়েছি, যা প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর কাম্য ছিল। এতদিন পত্রিকা কিনে পড়তাম, তাই সেটা তখন ছিল আপনাদের। কিন্তু এখন আমাদের বলতে কোন বাধা নেই তো?

: আগেও কি বাধা ছিল? গ্রাহক না হলে কিশোর ভারতীকে আপন মনে করা যাবে না, এমন কোন নিয়ম আছে না কি? আমার কিন্তু তা-ই জানা নেই।

অশোক কুমার বিশ্বাস, ২৪ পরগনা

—কিশোর ভারতী একবার যে পড়েছে, তারই ভাল লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। এই পত্রিকার মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় লেখা আছে, তা পড়ে আমরা কিশোররা যদি নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি, তবে সত্যি আমরা নিজেদের জীবন গঠন করতে পারবো এবং ভারতের কিশোর বলে পরিচয় দিতে পারবো।

: কিশোর ভারতীর স্বপ্ন সেদিন ফুল হয়ে ফুটবে।

শিবাংশু দে, জামশেদপুর

—সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত উপন্যাসগুলির কিশোরদের উপযোগী কাহিনীর চুম্বক নিয়মিতভাবে কিশোর ভারতীর পাতায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি?

: বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার কিশোর-উপযোগী চুম্বক প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তোমার এই প্রস্তাবও বিবেচনাযোগ্য।

—কিশোরদের গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের মাসিক বা ত্রৈমাসিক সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করলে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হবে। এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

: খুবই ভাল প্রস্তাব। যথা সময়ে একে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা হবে আশা করি।

ভাস্কর দাস, চক্রধরপুর

—আপনাদের সওয়াল জবাব বিভাগে যারা পত্র-মিত্র পাতাতে ইচ্ছুক তাদের পূর্ণ ঠিকানা না ছাপায় তাদের সাথে কি করে পত্র-মিত্র পাতান সম্ভব হবে?

আমি পত্র-মিত্র পাতাতে ইচ্ছুক। বয়স ১৫, হাইয়ার সেকেণ্ডারী বিজ্ঞানের ছাত্র। শখ: বিজ্ঞান, ডাকটিকিট ও পত্রিকা সংগ্রহ।

: যার সঙ্গে পত্র-মিতালি পাতাতে চাও, তার কাছে লেখা পত্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিও। পত্রে তোমার কোন ঠিকানা থাকবে না। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকবে। আমরাই সে পত্র তোমার আকাঙ্ক্ষিত পত্র-মিতার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু সওয়াল জবাব কি 'আপনাদের', না 'আমাদের'?

সোমনাথ দে, বেরমো

—আমার নামের আগে যে সংখ্যাটি দেওয়া হয়, সেটা কি?

: গ্রাহক-নম্বর নয় নিশ্চয়ই।

—ছাত্র বন্ধু চাই। বয়স ১৫ বছর হবি: গল্প লেখা ও গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা ও চিঠি লেখা।

উত্তমকুমার বটব্যাল, বাঁকুড়া

—কিশোর ভারতী ভারতীয় কিশোরদের হৃদয়াকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। আপনারা যে কায়ক্লেশে এমন সুন্দর একখানা পত্রিকা বের করেছেন, তার জন্য আপনা-দিগকে ধন্যবাদ জানাই।

: আর তোমাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

অসিত দাস, ডিব্রুগড়

—আচ্ছা, আমাদের দেশ থেকে রকেটে ঘোরার ব্যাপারটা কোন্ দিন থেকে চালু হবে বলতে পারেন? আমার কিন্তু খুবই ইচ্ছা হয় রকেটে করে দূরে মহাশূন্যে ঘুরে আসতে। এর থেকে মজার আর কি-ই বা আছে?

: পৃথিবীর অগণিত মানুষের সমাজে যেদিন ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ ও অভাব-অনটন থাকবে না, অশিক্ষা-কুশিক্ষা থাকবে না, থাকবে না যুদ্ধ, হানাহানি ও রক্তপাত আর শোষণ ও অত্যাচার, পৃথিবীর সর্বমানুষের জীবন যেদিন ফুলের মতো সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠার সুযোগ পাবে, সেইদিনই সিদ্ধ হবে তোমাদের এই মনস্কামনা। সেদিন যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। আজিকার এই পৃথিবীতে রকেটে, তো দূরের কথা, সাধারণ উড়োজাহাজে চড়ার সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

স্বপন চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান

—রামায়ণ প্রাচীন, না মহাভারত প্রাচীন?

: পণ্ডিতেরা বলেন, বর্তমানে যে রামায়ণ ও মহাভারত আমরা দেখি, তাদের সঙ্গে মূল রামায়ণ ও মহাভারতের পার্থক্য অনেক। বহু অংশ পরবর্তী কালে অন্যান্য লেখকের দ্বারা সংযোজিত হয়েছে। এইসব অংশকে বলে প্রক্ষিপ্ত। পণ্ডিতদের মতে এইসব প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে মহাভারতই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্য বেশী, পৃষ্ঠায় বেশী বইয়ের নাম কি? কত পৃষ্ঠার, লেখক কে এবং মূল্যই বা কত?

: এমন কোন বিশ্বখ্যাত বইয়ের নাম তো আমাদের মনে আসছে না, ভাই। তোমার জানা থাকলে লিখো, কেমন?

বিতানকুমার ঘোষ, জলপাইগুড়ি

—'কিশোর ভারতী' হাতে পেয়েই মনে হয়েছে এতদিনে আমার মনের মত জিনিস পেয়েছি। বোধ করি সকল পাঠক-পাঠিকারই তা মনে হয়েছে। দুটি প্রশ্নের জবাব আমি কিশোর ভারতী মারফৎ জানতে চাই।

(১) 'মানুষ থেকে দৈত্য' গল্পের মধ্যে যে ইলেকট্রার কথা বলা হয়েছে, সেটা কি সত্যই বিশ্বমেলায় দেখান হয়েছিল?

: লেখক তো তাই বলেছেন। তাঁর কথা অবিশ্বাস করার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

(২) হাতে আঁকা ছবি চাইনিজ কালি ছাড়া অন্য রংয়ে বা পেনসিলে আঁকলে কি গ্রাহ্য করা হবে না?

: না,—অবশ্য যদি কিশোর ভারতীতে প্রকাশ করতে হয়। অন্য কিছু দিয়ে আঁকা ছবির ব্লক করা দুরূহ ও বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ।

কিশোর সেনগুপ্ত, আসাম

—ভারত রাষ্ট্রসংঘে কত চাঁদা দেয়?

: সদস্য রাষ্ট্রগুলির দেয় চাঁদা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে (General Assemblyতে) প্রতি বছর স্থির হয়। ধরাবাঁধা কিছু নেই।

—বর্তমানে ভারতের সহিত পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের কুটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ রহিয়াছে? ভারতের সংবিধানের সহিত কোন্ রাষ্ট্রের সংবিধানের মিল আছে?

: উচ্চতর শ্রেণীর ভাল পাঠ্য বইয়ে এ প্রশ্নের জবাব পাবে।

কিশোর ভারতী

এজেন্ট হবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়। প্রতি সধারণ সংখ্যার দাম ৭৫ (পঁচাত্তর) পয়সা।

২। বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ।

৩। ভারতের সর্বত্র 'কিশোর ভারতী'র এজেন্সি দেওয়া হয়।

৪। ১০ কপির কমে পত্রিকার এজেন্সি দেওয়া হয় না।

৫। মফঃস্বলের এজেন্টদের কাছে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়। তবে যাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে নগদ মূল্যে সরাসরি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের পত্রিকা-প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে জানাতে হবে।

৬। যেসব এজেন্ট ডাকযোগে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ৫, টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয়। তবে যাঁরা আমাদের কার্যালয় থেকে নগদ মূল্যে সরাসরি পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ক্ষেত্রে এই টাকা জমা রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

৭। শতকরা ১০ খানা পর্যন্ত অবিক্রীত কপি ফেরৎ নেওয়া হয়। পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে উক্ত কপি আমাদের কাছে পৌঁছানো দরকার। যে ক'খানা কপি ফেরৎ পাঠানো হবে, পরবর্তী সংখ্যায় তা পূরণ করা হবে।

৮। এজেন্টের কাছে প্রেরিত ভি. পি. ফেরৎ হলে এবং তার সন্তোষজনক কারণ না দেখালে, এজেন্সি বাতিল করা হবে এবং জমার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৯। এজেন্সি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে হলে, কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

গ্রাহক / গ্রাহিকা হবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'কিশোর ভারতী' প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২। বাংলা আশ্বিন বা ইংরেজী অক্টোবর মাস থেকে 'কিশোর ভারতী'র বর্ষারম্ভ।

৩। 'কিশোর ভারতী'র গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদার হার (সডাক) বার্ষিক ৯ (নয়) টাকা। বছরে 'কিশোর ভারতী'র অন্যূন একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকাকে এর জন্য কোন অতিরিক্ত দাম দিতে হবে না।

বৃহৎ-কলেবর বিশেষ সংখ্যার জন্য রেজেস্ট্রী ডাকব্যয় বাবদ অতিরিক্ত ৯০ পয়সা পাঠাতে হবে। নচেৎ সাধারণ বুক-পোস্টে পাঠালে বিশেষ সংখ্যাটি যথাস্থানে না পৌঁছাবার সম্ভাবনা।

৪। চাঁদার টাকা মানি-অর্ডার করে পাঠাতে হয়, বা পত্রিকার কার্যালয়ে ঐ বাবদ নগদ টাকা জমা দিতে হয়। নগদ টাকা জমা দিলে অবশ্যই রসিদ নিতে হবে।

৫। বছরের যে কোন বাংলা মাস বা পত্রিকার যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

৬। মানি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে সম্ভাব্য গ্রাহক বা গ্রাহিকার পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স, পিতার নাম বা অভিভাবকের নাম এবং পত্রিকার কোন্ সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তা সুবোধ্য ভাষায় স্পষ্ট করে লিখে জানাতে হবে।

৭। গ্রাহক বা গ্রাহিকাকে 'কিশোর ভারতী'র পক্ষ থেকে সুদৃশ্য গ্রাহক-নিদর্শনপত্র দেওয়া হবে। তাতে গ্রাহক-নম্বর, নাম, ঠিকানা, বয়স প্রভৃতি বিষয় দেওয়া থাকবে।

৮। প্রতি ইংরেজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেই মাসের পত্রিকার সংখ্যা না পেলে, ঐ মাসের ২২ তারিখের মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে তা অবশ্যই জানাতে হবে।

৯। কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা, ইচ্ছা করলে, গ্রাহক নিদর্শনপত্র বা চাঁদা জমার রসিদ দেখিয়ে পত্রিকার কার্যালয়ে এসে সরাসরি পত্রিকা নিতে পারবে। সরাসরি কার্যালয় থেকে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পত্রিকার সেই সংখ্যা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পত্রিকার কার্যালয়ে সেই মর্মে জানাতে হবে। কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা তার কপি রেজেস্ট্রী ডাকযোগে নিতে চাইলে, তাকে রেজেস্ট্রী খরচ বাবদ বছরে অতিরিক্ত ১০·৮০ টাকা বা ছয় মাসে অতিরিক্ত ৫·৪০ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।

১০। গ্রাহক-গ্রাহিকারা সমস্ত চিঠিপত্রাদিতেই গ্রাহকনিদর্শন-পত্র অনুযায়ী গ্রাহক-নম্বর, নাম, ঠিকানা প্রভৃতি স্পষ্টভাবে লিখবে। যাদের তখনও গ্রাহক-নিদর্শনপত্র দেওয়া হয়নি, তারা নিজেদের 'নতুন গ্রাহক' বলে এবং কোন্ মাস থেকে গ্রাহক হয়েছে, তা উল্লেখ করবে।

১১। ঠিকানা বদল হলে, সঙ্গে সঙ্গেই অন্ততঃ সেই ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকার কার্যালয়ে জানাতে হবে।

১২। এতৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে কর্মাধ্যক্ষের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১। লেখা বা রচনা (গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, ইত্যাদি), ফোটো, আঁকা ছবি প্রভৃতি প্রকাশের জন্য পাঠাবার সময় লেখক বা শিল্পীর পুরো নাম ও ঠিকানা অবশ্যই দিতে হবে, নচেৎ তা বিবেচিত হবে না।

২। মনোনীত লেখা বা রচনা, ফোটো, আঁকা ছবি প্রভৃতি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, তা জানানো সম্ভব নয়।

৩। লেখা বা রচনাদি সম্পাদনা করার বা পরিবর্তনাদি সাধনের পূর্ণ অধিকার পত্রিকা-সম্পাদকের থাকবে।

৪। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ভাবে কালি দিয়ে লিখে পাঠাতে হবে। বানানে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন বাঞ্ছনীয়।

৫। ফোটো সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। হাতে আঁকা ছবি ভাল সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চাইনিজ কালিতে পরিষ্কার ভাবে এঁকে পাঠাতে হবে।

৬। লেখা, ছবি বা ফোটোর সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে ফলাফল জানানো বা অমনোনীত লেখা, ছবি বা ফোটো ফেরৎ পাঠানো কিংবা ঐ সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে ডাকটিকিট না থাকলে অমনোনীত রচনাদি নষ্ট করে ফেলা হয়।

৭। গ্রাহক-গ্রাহিকারা লেখা, ছবি, ফোটো, ধাঁধা, প্রশ্নোত্তর, ইত্যাদি বা ঐসব সংক্রান্ত চিঠিপত্র পাঠাবার সময় গ্রাহক-নম্বর, পুরো নাম, ঠিকানা, বয়স পরিষ্কার করে লিখবে। যাদের তখনও গ্রাহক-নম্বর দেওয়া হয় নি, তারা নিজেদের 'নতুন গ্রাহক' বলে এবং কোন্ মাস বা সংখ্যা থেকে গ্রাহক হয়েছে, তা উল্লেখ করবে।

৮। এতসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সম্পাদক বা কর্মাধ্যক্ষের নামে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে:

কিশোর ভারতী ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯ ফোনঃ ৩৪-৩১৫৭ ও ৩৫-১৯৪৪

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

দেশ

দেশ পত্রিকা লিখেছেনঃ "কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির আয়ু মাত্র এক বৎসর, এরই মধ্যে শিশু সাহিত্যের আসরে সে প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পেরেছে। ......**বাংলার প্রায় শতাধিক সাহিত্যিকের সচিত্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটি কিশোরদের পূজোর দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে রাখতে পারবে।**......"

যুগান্তর (সাময়িকী)

যুগান্তর (সাময়িকী) বলেনঃ "কিশোরদের মন আর চাহিদা মেটাবার মতো অথচ বর্তমান বিজ্ঞান, শিল্প আর সাহিত্যের ক্রম-অনুযায়ী তাদের মানসিক পরি-পুষ্টির সহায়ক পত্র-পত্রিকার অভাব এদেশে খুবই। এরই মাঝে 'কিশোর ভারতী' বর্ষকালের মধ্যেই এদিক থেকে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি যে সফল করতে পেরেছেন আর তাদের উদ্যম যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান শারদীয়া কিশোর ভারতী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ। **বাংলাদেশের প্রবীণ অনেক লেখকেরই লেখা এতে আছে। একথা বলা চলে যে, শুধু 'লেখার' জন্যই তাঁরা লেখেন নি, আমাদের কিশোরদের মনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা লিখেছেন।** তার উপর সুন্দর কাগজে, চিত্তাকর্ষক ছবিতে সংখ্যা-খানি ভরপুর। যাঁদের ছবি আছে, তাঁরাও কুশলী ও কৃতী শিল্পী।......"

দৈনিক বসুমতী

দৈনিক বসুমতী-র সুচিন্তিত অভিমতঃ "......ছোটদের উপযোগী যে কয়েক-খানি শারদসংকলন হাতে পেয়েছি তার মধ্যে **এই বৎসরের "শারদীয়া কিশোর ভারতী" অদ্বিতীয়। এই রকম একখানি শিশুমনোপযোগী সুন্দর শারদসংকলন যে কোন বাড়ীতে, লাইব্রেরীতে, স্কুলে রাখা প্রয়োজন। রুচিসম্পন্ন সম্পাদনা শিশুদের নিঃসন্দেহে আনন্দ দেবে।**......"

বিদ্যোদয়ের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
এক জাহাজ গল্প

প্রথম সংগ্রহ **ময়ূরপঙ্খী** [৬·০০]
দ্বিতীয় সংগ্রহ **মকরমুখী** [৬·০০]
তৃতীয় সংগ্রহ **সাগরদাঁড়ী** [যন্ত্রস্থ]

ছোটদের জন্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একাই এক অপরূপ গল্পের মায়াপুরী গড়ে তুলেছেন। কি সেখানে নেই? পরীদের পাখার শব্দের মত স্বপ্নঝিমঝিম গল্প আছে, আছে ইতিহাসের ঝলমলে রঙিন গল্প, রক্তে দোলা লাগানো গল্প দুরন্ত দুঃসাহসের, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করা গল্প রহস্যের, আছে গায়ে কাঁটা দেওয়া ভয়ের গল্প, মজাদার কৌতুকের যেমন, তেমনি অতি মিষ্টি মন জুড়িয়ে দেওয়া গল্প আর আছে বিজ্ঞানের ভেলকি দিয়ে বানানো আশ্চর্য সব গল্প যাতে তাঁর জুড়ি নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সব গল্প একত্রে সংগ্রহ করে **এক জাহাজ গল্প** সংকলনে প্রকাশ করা হল। কিশোরদের জন্যে তাঁর যাবতীয় গল্পের (ঘনাদার গল্পের নমুনা সহ) এ-ধরনের সংকলন এই সর্বপ্রথম।

ময়ূরপঙ্খী

প্রথমে আঠারোটি বিচিত্র স্বাদের গল্পের পণ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে **ময়ূরপঙ্খী**। যশস্বী শিল্পী সূর্য রায়ের আঁকা ছোটয় বড়য় মিলিয়ে ছত্রিশখানি অপরূপ ছবি ও বহুবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট **ময়ূরপঙ্খী**-কে সাজিয়েছে নয়নাভিরাম সাজে।

মকরমুখী

ময়ূরপঙ্খী-র পরেই সাজোসাজো রবে বার হয়েছে **মকরমুখী** সতেরটি নানান রসের গল্পের সওদায় বোঝাই হয়ে। যেমনি আশ্চর্যসুন্দর সব গল্প, তেমনি চোখ-জুড়োন-এর ছবির বাহার আর প্রচ্ছদপটের বুঝি তুলনা নেই। এর ছবিগুলিও এঁকেছেন সূর্য রায়। ছোটয় বড়য় এতে ছবির সংখ্যা চৌত্রিশ।

সবশেষে আসছে **সাগরদাঁড়ী**।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আর কয়েকখানি বই

শুক্রে যারা গিয়েছিল [৩·০০] **ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস** [২·২৫] **গল্প আর গল্প** [২·২৫]

আরও কয়েকখানি বই

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬·০০ সংকলন
সাইবিরিয়ার শেষ মানুষ ২·০০ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
স্বর্ণমুকুট ২·৫০ গোপেন্দ্র বসু
আনন্দমঠ ২·০০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দারুমূর্তির রহস্য ১·৬২ মণীন্দ্র দত্ত
সুন্দরবনের চিঠি ১·৬২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯ * ফোন : ৩৪-৩১৫৭